

আমাদের
দেশবন্ধু

আমাদের দেশবন্ধু

আর, মজুমদার, এম, কম।

তড়িৎ প্রকাশনী

প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা

১৮ জে, টেমার লেন, কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
বি, মজুমদার
১৮ জে, টেমার লেন, কলিকাতা-৯

মূল্য : দশ টাকা

মুদ্রণে :
শ্রীমা প্রেস, নবদ্বীপ।

দেশপ্রেমের জীবন্ত বিগ্রহ দেশবন্ধু।

জাগ্রত বাংলার হৃদয়ের ছবি তিনি।

ত্যাগে উজ্জ্বল, প্রেমে ভাস্বর ও কর্মে মহান্ তাঁর জীবন আমাদের জাতীয় জীবনের এক পরম সম্পদ। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তিনি ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা ও অপরাজেয় যোদ্ধা। ব্রিটিশ রাজশক্তিকে নতিস্বীকার করতে হয়েছিল তাঁর শক্তির কাছে।

আজ তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে দেশবন্ধুকে আমরা নতুন করে স্মরণ করব আর তাঁর জীবন থেকে সংগ্রহ করব জীবনগঠনের উপাদান। দেশকে ভালবাসার যে মূল্য তিনি দিয়েছিলেন, সেই তাঁর আত্মোৎসর্গের আলোকে তাঁর মহিমান্বিত জীবনের দৃষ্টান্তকে সামনে রেখে, স্বাধীন ভারতের ছেলেমেয়েরা যেন দেশকে ভালবাসতে শেখে।

৯০, বাগুইআটি রোড
দক্ষিণ দমদম
কলিকাতা-২৮ ; আগস্ট, ১৯৭০

মণি বাগচি

আমার বাংলাকে

আমি আশৈশব প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছি। যৌবনে সকল চেষ্টার মধ্যে আমার বাংলার যে মূর্তি আমার সকল দৈন্যে, সকল অযোগ্যতা অক্ষমতা সত্বেও প্রাণে প্রাণে জাগাইয়া রাখিয়াছি, আজ এই পরিণত বয়সে আমার মানসমন্দিরে সেই মূর্তি আরো জাগ্রত জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। আমি আমাকে বাঙালি বলিতে গর্ব অনুভব করি। বাঙালির একটা নিজস্ব সাধনা আছে, শাস্ত্র আছে, ধর্ম আছে, কর্ম আছে, বীরত্ব আছে, ইতিহাস আছে, ভবিষ্যৎ আছে। বাঙালিকে যে অমানুষ বলে, সে আমার বাংলাকে চেনে না।

—দেশবন্ধু। ১৯১৭

চিত্তরঞ্জন

বিপিনচন্দ্র পাল

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ আর ইহজগতে নাই। তাঁহার সহিত আমাদের যতই মতভেদ থাকুক, গত পঁচিশ বৎসর দেশের কাজের হিসাব-নিকাশ করিলে, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কাছে দেশ যে গভীর ঋণপাশে আবদ্ধ আছে তাহা স্পষ্ট হইয়া চোখে পড়িবে। মত ও নীতির গণ্ডী ছাড়াইয়া চিত্তরঞ্জনের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সতত উজ্জ্বল। দেশের মঙ্গলের জন্য, জাতির উন্নতির জন্য যাহা তিনি আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন, তাহার জন্য কোন প্রকার ত্যাগ স্বীকারেই চিত্তরঞ্জন কুণ্ঠিত হন নাই। জাতির মুক্তিলাভের জন্য যে উপায়কে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা দ্রুত কার্যকর বলিয়া মনে করিয়াছেন তাঁহার সাধনায় তিনি নিজেকে টুকরা টুকরা করিয়া বলি দিয়াছেন—ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

চিত্তরঞ্জনের দেশপ্রেম দেশের ইতিহাসে চিরকাল উজ্জ্বল স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে। তাঁহার মৃত্যু দেশ-মাতৃকার নিকট আত্মবলি বলিয়াই মনে হয়। তাঁহার জীবনের দীপ-সলিতা দেশ-সেবার কঠোর কর্মের অনলে পুড়াইয়া তিনি নিজেই জ্বালাইয়া নিঃশেষ করিলেন। কিন্তু তাঁহার তো মৃত্যু নাই। ভারতাকাশের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করূপেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের স্মৃতি তাঁহার দেশবাসীর মানসপটে সর্বদা দীপ্যমান থাকিবে।*

---

* ১৯২৫ সালে প্রদত্ত শ্রদ্ধাঞ্জলির অংশবিশেষ



দীনের বন্ধু, দেশের বন্ধু, মানব-বন্ধু তুমি,
চেয়ে দেখ আজ লুটায় বিশ্ব তোমার চরণ চুমি।

১

সকালবেলা।

ভবানীপুরের এক সুরম্য অট্টালিকার একতলার একটি ঘরে এক কিশোর একমনে পাঠরত। সুমধুর কণ্ঠে বালক পড়ছিল ঃ

আমাদের দেশে সেই
ছেলে কবে হবে।
কথায় না বড় হয়ে
কাজে বড় হবে।
মুখে হাসি বুকে বল
তেজে ভরা মন,
মানুষ হইতে হবে
এই যার পণ।

এক প্রৌঢ় দরজার কাছে দাঁড়িয়ে শুনছিলেন।

কিশোরের পড়া শেষ হলে তিনি ঢুকলেন ঘরের মধ্যে। এলেন তার খুব কাছে। রাখলেন তার মাথায় দুখানি হাত। স্নেহভরা কণ্ঠে ডাকলেন, চিত্ত !

—এ কি, জ্যাঠামশাই আপনি !

—হ্যাঁ, তুমি যে পদ্যটা পড়ছ তার মানে বুঝেছ ?

—বুঝেছি জ্যাঠামশাই। এতো খুব সোজা।

—না, আমি সে কথা বলছি না।

—তবে কি বলছেন ?

—বলছিলাম কি বড় হয়ে যদি তুমিও ঠিক এই রকমটি হবার চেষ্টা করো, তাহলে শুধু বংশের নয়, দেশেরও মুখ তুমি উজ্জ্বল করতে পারবে।

বালক ঘাড় নাড়ল।

প্রৌঢ় ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

ইনিই চিত্তরঞ্জন দাশ।

ইনিই একদিন 'দেশবন্ধু' নামে সারা ভারতে বিখ্যাত হন।

সেই কিশোর বয়সেই ইনি মানুষ হওয়ার পণ করেছিলেন। তিনি বড় হয়েছিলেন কথায়—বড় হয়েছিলেন কাজে। এঁর জীবনের কথাই আজ তোমাদের বলব।

বিক্রমপুরের তেলিরবাগ।

এখানে বাস করত এক সম্ভ্রান্ত বৈদ্য পরিবার। খ্যাতি, প্রতিপত্তি, মহানুভবতা, দানশীলতা, অতিথিসেবা ও পরোপকারিতায় সেদিন তেলিরবাগের এই বৈদ্য পরিবার খুব প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল। আবার জাতীয়তাবোধ ও স্বদেশপ্রীতির জন্যও বিখ্যাত ছিল। এই পরিবারের উপাধি ছিল 'দাশ'।

অতি প্রাচীন গ্রাম এই তেলিরবাগ। ঢাকা জেলায় বিক্রমপুরের যেমন একটা নাম-ডাক ছিল, তেমনি আবার সমগ্র বিক্রমপুরের মধ্যে তেলিরবাগ গ্রামটিরও খুব নাম-ডাক ছিল। সত্যি কথা বলতে ঐ দাশ-পরিবারের জন্যই তেলিরবাগের এই খ্যাতি।

দাশ-পরিবার এক আদর্শ পরিবার।

এমন অতিথিপরায়ণ, স্বজনবৎসল ও উদারহৃদয় পরিবার সেদিন পূর্ববাংলার এই অঞ্চলে খুব কমই ছিল। তেলিরবাগের এই দাশ-পরিবার শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে অগ্রণী ছিল। লোকে বলত দাশ-

পরিবার যেন উকিল-ব্যারিস্টারের পরিবার। একটি পরিবারের তিন-পুরুষের মধ্যে এত আইনজীবী মানুষ বড় একটা দেখা যায় না। এই পরিবারের উত্তরপুরুষ হিসাবে আমরা পাই কালীমোহন, দুর্গামোহন ও ভুবনমোহনকে। এঁরা তিন সহোদর। এঁদের ঠিক আগের পুরুষ থেকেই দাশ-পরিবার তেলিরবাগ পরিত্যাগ করে বরিশালে এসে বসবাস করতে থাকে। এঁদের বাবা ও কাকা দুজনেই ছিলেন নাম-করা উকিল।

তিন ভাই—কালীমোহন, দুর্গামোহন ও ভুবনমোহন—বরিশালে ওকালতি আরম্ভ করেন। ওকালতিতে তাঁদের বেশ পসারও হয়। যে সব গুণের জন্য তেলিরবাগে তাঁদের বংশের খ্যাতি ছিল, সেই খ্যাতি বরিশালেও ছড়িয়ে পড়ল। বরিশালবাসীরাও তাঁদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কিছুদিন বরিশালে আইন-ব্যবসায়ের পর তিন ভাই মনস্থ করলেন, মফঃস্বলে তাঁরা আর ওকালতি করবেন না—তাঁরা কলকাতা যাবেন, আর কলকাতার হাইকোর্টে ওকালতি করবেন। তাই হলো।

তিন ভাই চলে এলেন কলকাতায়। এখানে এসে পটলডাঙায় একটা বড় বাড়ী ভাড়া করে বাস করতে লাগলেন। এ ঘটনা ১৮৭০ সালের। এই বাড়ীতেই চিত্তরঞ্জনের জন্ম।

পাঁচ বছর পটলডাঙায় বাস করার পর তিন ভাই চলে এলেন দক্ষিণ কলকাতায়। ভবানীপুর অঞ্চলে বড়ভাই কালীমোহন একখানি সুন্দর বসতবাড়ী তৈরি করলেন। আজ যেখানে "চিত্তরঞ্জন সেবাসদন" (১৪৮, রসারোড)—এই বাড়ীই কালীমোহনের বাড়ী। এই বাড়ীর নাম ছিল 'কালীমোহন আলয়'। কালীমোহন নিজে বাড়ী করলেও তিন ভাই একসঙ্গে এই বাড়ীতেই বাস করতে লাগলেন। দাশ-পরিবার চিরদিনই একান্নবর্তী পরিবার। আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে একসঙ্গে বাস করাই ছিল এই পরিবারের চিরন্তন রীতি।

যৌবনে তিন ভাই-ই ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করেন।

এই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রাজা রামমোহন রায়—নবীন ভারতের যুগপুরুষ। বাংলা দেশের সমাজ, সাহিত্য ও ধর্ম—সব ক্ষেত্রে যে জাগরণ এসেছিল তার মূলে ছিল এই ধর্ম। হিন্দু সমাজের কুসংস্কার এবং সংকীর্ণতার পঙ্ক থেকে স্বদেশ ও জাতিকে উদ্ধার করেছিলেন রামমোহন। আবার অন্যদিকে খ্রীষ্টান পাদ্রীদের বিরুদ্ধেও দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। পৃথিবীর সকল ধর্মের মধ্যে তিনি এক সত্য উপলব্ধি করে এক ভগবানকে দেখেছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম ধর্ম ও ব্রাহ্ম সমাজের ভিত্তি ছিল এই উদার মতবাদ ও বিশ্বজনীন প্রেম।

হিন্দু সমাজের একটা সুসংস্কৃত রূপ ছিল রামমোহনের এই ব্রাহ্ম সমাজ। এই উদার ও বিশ্বজনীন ধর্মের প্রতি যে কালীমোহন ও তাঁর অপর দুই সহোদর আকৃষ্ট হবেন, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

কালীমোহন কিন্তু পরে প্রায়শ্চিত্ত করে হিন্দু ধর্মে ফিরে আসেন। তাঁর রসারোডের বাড়ীতে তিনি একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সেবাসদনের এক কোণে সেই মন্দিরটি আজও বিদ্যমান। কালী-মোহনের জীবিতকালেই তাঁর দুই পুত্র এবং এক কন্যার মৃত্যু ঘটে। তিনি ভুবনমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র বসন্তরঞ্জনকে দত্তক গ্রহণ করেন। মৃত্যুর পূর্বে কালীমোহন উইল করে এই রসারোডের বাড়ী তাঁর দত্তক-পুত্রকে দিয়ে যান। কিন্তু বসন্তরঞ্জনেরও অকালমৃত্যু ঘটে। মৃত্যুকালে বসন্তরঞ্জন এই বাড়ী তাঁর গর্ভধারিণী নিস্তারিণী দেবীকে দান করে যান।

নিস্তারিণী দেবীর মৃত্যুর পর তাঁর দুই পুত্র—চিত্তরঞ্জন ও প্রফুল্ল-রঞ্জন এই বাড়ীর মালিক হন। পরে প্রফুল্লরঞ্জন তাঁর অংশ অগ্রজ চিত্তরঞ্জনকে বিক্রি করে দেন এবং পাটনায় এসে বাস করতে থাকেন।

এইভাবে চিত্তরঞ্জন রসারোডের বাড়ীর সম্পূর্ণ অধিকারী হন। শেষ-জীবনে এই বিশাল অট্টালিকা চিত্তরঞ্জন দেশবাসীকে দান করে যান। বহু স্মৃতি-বিজড়িত এই বাড়ীই চিত্তরঞ্জন সেবাসদন নামে পরিচিত।

কালীমোহন যেমন ছিলেন তেজস্বী, তেমনি ছিলেন নির্ভীক। কলকাতা হাইকোর্টের বহু ইংরেজ বিচারপতি অনেক সময় তাঁর তেজস্বিতা ও নির্ভীকতায় মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়েছেন। তাঁর চরিত্রের এই দুটি বিশেষ গুণ ভ্রাতুষ্পুত্র চিত্তরঞ্জনের উপর পুরোমাত্রায় বর্তে। তিনিও তাঁর গৌরবদীপ্ত কর্মজীবনে আদালতে দাঁড়িয়ে বহুবার ঠিক তেমনই তেজস্বিতা ও নির্ভীকতার পরিচয় দিয়ে নিজ বংশের মর্যাদা বজায় রেখেছিলেন।

কালীমোহনের মেজভাই দুর্গামোহন—ব্রাহ্ম সমাজের এক নেতৃ-স্থানীয় পুরুষ—সমাজ-সংস্কারে অগ্রণী। তাঁর সময় থেকেই রসা-রোডের এই বাড়ী যেন সকল রকম সাংস্কৃতিক ও সামাজিক আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল হয়ে ওঠে। আবার চিত্তরঞ্জনের সময়ে এই বাড়ীই হয়ে ওঠে বাংলা তথা সমগ্র ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের এক পীঠস্থান। বাংলার সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে রসারোডের বাড়ীটি সত্যিই এক গৌরবের স্থান অধিকার করে—যেমন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী অথবা রামবাগানের দত্তবাড়ী।

দুর্গামোহন ছিলেন খুব জেদী। কোনও কাজ যদি তিনি করণীয় বলে মনে করতেন, তাহলে কোনক্রমেই তিনি সেই কাজ থেকে নিবৃত্ত হতেন না। সকলের বাধা-বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি সেই কাজটি সম্পন্ন করতেন। তাঁর মেজ জ্যাঠামশাইয়ের এই গুণ পেয়েছিলেন চিত্তরঞ্জন।

দুর্গামোহনের তিন ছেলেই—সত্যরঞ্জন, সতীশরঞ্জন ও যতীশ-রঞ্জন—ব্যারিস্টার ছিলেন। কনিষ্ঠ যতীশরঞ্জন উত্তরকালে রেঙ্গুন

হাইকোর্টের বিচারপতি হয়েছিলেন। দেশ-বিশ্রুত বৈজ্ঞানিক জগদীশ-চন্দ্র বসু ছিলেন দুর্গামোহনের অন্যতম জামাতা।

ব্রাহ্ম সমাজের উন্নতির জন্য দুর্গামোহন অকাতরে অর্থ ব্যয় করতেন।

ভুবনমোহন ছিলেন ভাইদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। তাঁর স্ত্রী নিস্তারিণী দেবী। স্নেহ, মমতা ও স্বজন-প্রীতি, দীন-দুঃখীকে মুক্তহস্তে দান, ক্ষুধার্তকে অন্নদান প্রভৃতি বিবিধ সদ্‌গুণের জন্য তিনি দাশ-পরিবারের আদর্শ গৃহিণীরূপে সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেন।

এই ভুবনমোহন ও নিস্তারিণী দেবী ছিলেন চিত্তরঞ্জনের জনক-জননী। চিত্তরঞ্জন ছিলেন তাঁদের প্রথম সন্তান। ভুবনমোহন হাইকোর্টে ওকালতি করতেন, পরে এ্যাটর্নিসিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। আইন-শাস্ত্রে তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল, আর ছিল মকদ্দমা চালাবার অদ্ভুত ক্ষমতা। উত্তরাধিকারসূত্রে পুত্র চিত্তরঞ্জন পিতার এই প্রতিভার অধিকারী হন। তাঁর সময়ে ভারতবর্ষে আইন-ব্যবসায়ে তিনি শীর্ষস্থান অধিকার করেন। এ-বিষয়ে অবশ্য তাঁর প্রতিভা কম ছিল না।

আইন-ব্যবসায়ে ভুবনমোহনের প্রচুর অর্থাগম হয়। দাশ-পরিবারের বদান্যতা ও উদারতা তাঁর মধ্যে অধিকমাত্রায় দেখা যায়। পরের দুঃখ দেখলে, অথবা কেউ অভাবগ্রস্ত হয়ে তাঁর সামনে দাঁড়ালে ভুবনমোহন স্থির থাকতে পারতেন না। পিতার এই গুণটিও চিত্তরঞ্জন পুরোমাত্রায় লাভ করেছিলেন। সকলকে সাধ্য-মতো, কখনো বা সাধ্যের অতিরিক্ত সাহায্য করাই ছিল ভুবনমোহনের চরিত্রের বিশেষত্ব। কারো উপকার করে সেই উপকৃত ব্যক্তিকে তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ দিতেন না।

কিন্তু ভুবনমোহনের কর্মক্ষেত্র শুধু তাঁর আইন-ব্যবসায়ের মধ্যেই

সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি ছিলেন সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক এবং প্রচুর অর্থ দিয়ে তিনি ব্রাহ্ম সমাজকে পুষ্ট করেন। সমাজের মুখপত্র 'দি ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন'-এর সম্পাদনার দায়িত্বও তিনি গ্রহণ করেছিলেন। ভুবনমোহন একজন সুদক্ষ লেখকও ছিলেন। জনমত গঠনে তাঁর লেখনী সার্থক হয়েছিল। পিতার এই গুণটিও পুত্র চিত্তরঞ্জন লাভ করেছিলেন। পিতার রাজনীতিপ্রবণতাও পুত্র চিত্তরঞ্জনের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল।

তিন ভাইয়ের মধ্যে ভুবনমোহনই ছিলেন বেশী শিক্ষিত এবং সংস্কৃতিবান। ব্রাহ্ম হলেও পারিবারিক আচার-আচরণে তিনি বহুলাংশে হিন্দুভাবাপন্ন ছিলেন। ব্রাহ্ম পিতামাতার সন্তান হয়েও আচার-আচরণে চিত্তরঞ্জনও অনেকটা হিন্দুভাবাপন্ন ছিলেন। ভুবন-মোহনের চরিত্রে অনেক সদ্‌গুণের বিকাশ ঘটে। নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের মানুষ ছিলেন তিনি—অমায়িক প্রকৃতি, সদা মিষ্টভাষী ও সদালাপী এই মানুষটির মধ্যে অভিমান বা অহঙ্কারের লেশ মাত্র ছিল না। শেষজীবনে তাঁকে যে দুঃখ ও দারিদ্র্য ভোগ করতে হয়েছিল, তার মূলে ছিল তাঁর বদান্যতা। পরের উপকার করতে গিয়েই তাঁকে সর্বস্বান্ত হতে হয়। ঋণগ্রস্ত এক বন্ধুর চল্লিশ হাজার টাকার ঋণের বোঝা তিনি মাথায় নিয়েছিলেন। সেই ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম হয়ে ভুবনমোহনকে দেউলিয়া আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। ফলে, দাশ-পরিবারে তখন থেকে দেখা দেয় অর্থের অনটন। আর লোকচক্ষেও তাঁদের সামাজিক মর্যাদা যেন অনেক ছোট হয়ে যায়। বংশের এই কলঙ্কমোচন আর পিতাকে ঋণমুক্ত করেছিলেন চিত্তরঞ্জন।

সে কাহিনী আমরা যথাস্থানে বলব। পরিবার ও পরিবেশেই শৈশবে মানুষের চরিত্র গঠিত হয়। চিত্তরঞ্জনের শৈশবকালে তাঁর

চরিত্র গঠনে এই দুটি গুণই ছিল বিশেষ অনুকূল। একদিকে তাঁর দুই জ্যাঠামশাই ও দেবতুল্য পিতার চরিত্রের প্রভাব তাঁর উপর যেমন প্রবল ছিল, অন্যদিকে তেমনি তাঁর মায়ের প্রভাবও তাঁর উপর বড়ো কম ছিল না। 'বাবা ও জ্যাঠামশাইদের চেয়ে আমার উপর আমার মায়ের প্রভাবটাই যেন বেশি ছিল'—এই কথা বলতেন চিত্তরঞ্জন। বলতেন তিনি সকল সময় সকলের কাছে। অত্যন্ত মাতৃভক্ত সন্তান ছিলেন চিত্তরঞ্জন। 'মা-ই তো জীবনের সব'—মাতৃভক্ত চিত্তরঞ্জনের এই কথাটি মনে রাখবার মতো।

আকাশের মতো উদার ছিল নিস্তারিণী দেবীর হৃদয়। সেই উদারতার সবটাই বুঝি তাঁর প্রথম সন্তান চিত্তরঞ্জন জন্মসূত্রে লাভ করেছিলেন। স্বামী যখন দেউলিয়া আদালতের আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন, তখন সংসারের সেই সংকটকালে নিস্তারিণী দেবী যে দায়িত্ব-বোধের পরিচয় দিয়ে ভুবনমোহনের দুশ্চিন্তার ভার লাঘব করে-ছিলেন, তা দেখে অনেকেই বিস্মিত হয়েছিলেন। বিস্মিত হয়েছিলেন আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী—তাঁর স্বামীর বন্ধু ও দাশ-পরিবারের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী। প্রতিবেশিনীদের কেউ যদি এসে তাঁর দুঃখে সমবেদনা জানাত, তখন তিনি তাদের বলতেন—'সুখের সময় সুখভোগ করেছি, এখন দুঃখের দিনে ভগবানের কাছে নালিশ করব কেন?' বিপদে বা সম্পদে, কোন অবস্থাতেই তিনি বিচলিত হতেন না, বরং প্রসন্নচিত্তে সংসারে স্বামীর আদর্শকেই সামনে রেখে চলতেন।

স্নেহ ও কোমলতায় পরিপূর্ণ ছিল তাঁর অন্তর।

আত্মীয় বা অনাত্মীয় সকলের জন্যই ঠাঁই ছিল সেখানে।

দাশ-পরিবার একটি বৃহৎ পরিবার ছিল। আত্মীয়-কুটুম্ব ছাড়া অতিথি-অভ্যাগতদের নিত্য আনাগোনা ছিল। তাঁদের পরিচর্যায় এতটুকু ত্রুটি যাতে না হয়, সেদিকে সব সময়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখতেন

নিস্তারিণী দেবী। তাঁর মেজ ভাশুরের মাতৃহারা ছেলেমেয়েদের তিনি তাঁর নিজের ছেলেমেয়ের মতোই সমান স্নেহ দিয়ে লালনপালন করতেন। আবার স্বামীর মতোই দানে ছিলেন তিনি মুক্তহস্ত। আর্ত এবং অভাবগ্রস্ত যে কেউ যখনই তাঁর সাহায্যপ্রার্থী হয়েছে, কাউকে তিনি বিমুখ করতেন না। দয়া-দাক্ষিণ্য, স্নেহ-মমতা ও সেবায় নিস্তারিণী দেবী সত্যিই এক আদর্শ নারী ছিলেন।

এই রকম এক আদর্শ-পরিবারে আদর্শ-চরিত্র পিতামাতার সন্তান হয়েই জন্মগ্রহণ করেন আমাদের চিত্তরঞ্জন। সেই উন্নত ভাবধারায় গঠিত হয়েছিল তাঁর মন। তাই না উত্তরকালে সেই বালক হয়ে উঠতে পেরেছিলেন নিখিল-চিত্তরঞ্জন।

২

১৮৭০, ৫ই নভেম্বর।

পটলডাঙায় কালীমোহন দাশের বাড়ীতে শাঁখ বেজে উঠল।

সেই শঙ্খধ্বনি ঘোষণা করল এক ক্ষণজন্মার আবির্ভাবকে।

সেই শঙ্খধ্বনিতে সেদিন শুধু ভুবনমোহন দাশের প্রথম পুত্রের জন্ম বিঘোষিত হয়নি—ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের এক অজেয় বীরপুরুষের জন্মবার্তাও শোনা গিয়েছিল। শাঁখের আওয়াজ শুনে অন্দরমহলে সকলের আগে ছুটে এলেন দুর্গামোহন। তিনিই সকলের আগে প্রসূতির আগারে এসে নবজাতকের মুখ দেখলেন—দেখলেন তার ললাট। তারপর বৈঠকখানায় এসে কনিষ্ঠ ভুবন-মোহনকে বললেন—এই ছেলে বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে।

অক্ষরে অক্ষরে ফলেছিল এই ভবিষ্যদ্বাণী।

শুধু বংশের নয়, সমগ্র দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছিল সেই নবজাতক। নামকরণের সময় দুর্গামোহনই শিশুর নাম রেখেছিলেন 'চিত্তরঞ্জন'। সুন্দর নাম। সার্থক হয়েছিল এই নাম সেই শিশুর জীবনে। নিখিল মানুষের চিত্তকে উদ্ভাসিত করেছিলেন তিনি সকল দিক থেকে। পূর্বপুরুষদের বহু পুণ্যফলে তেলিরবাগের এই বিখ্যাত বৈদ্য পরিবারে যিনি ঐদিন জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেদিন ভাগ্য-বিধাতা তাঁর জন্মলগ্নে ললাটে যে জয়ের তিলক এঁকে দিয়েছিলেন, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বাঙালীরও বহু পুণ্যফলে এই বাংলা দেশে—সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা সোনার বাংলায়—জন্মগ্রহণ করেছিলেন

চিত্তরঞ্জন। তিনি সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন এই বাংলা দেশকে। কেমন ভালবাসতেন, জানো ? তাঁর নিজের কথাতেই বলি :

"আমার বাংলাকে আমি আশৈশব প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছি। যৌবনে সকল চেষ্টার মধ্যে আমার বাংলার যে মূর্তি প্রাণে প্রাণে জাগাইয়া রাখিয়াছি এবং আজ এই পরিণত বয়সে আমার মানস-মন্দিরে সেই মোহিনীমূর্তি আরও জাগ্রত জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। আমি আমাকে বাঙালি বলিতে একটা অনির্বচনীয় গর্ব অনুভব করি।"

এই কথা চিত্তরঞ্জন বলেছিলেন ১৯১৭ সালে ভবানীপুর প্রাদেশিক সম্মিলনের সভাপতিরূপে। তাইতো আমরা দেখতে পাই, উত্তরকালে সর্ব-ভারতীয় রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেও তিনি বাংলাকে ও বাঙালীকে বিস্মৃত হননি। সব সময় ভেবেছেন বাংলার কথা, বাঙালীর কথা। বাংলাই ছিল তাঁর ধ্যান-জ্ঞান, কর্ম ও চিন্তার কেন্দ্র-বিন্দু। তাইতো বাঙালীর হৃদয়-সিংহাসনে চিত্তরঞ্জনের আসন অক্ষয়।

বংশগৌরব মানুষের জীবন গঠনে সহায়তা করে।

পরিবেশও তেমনি গঠন করে আমাদের জীবন।

যে সময়ে ও যে সমাজে আমরা জন্মগ্রহণ করি, সেই সময় ও সেই সমাজের পরিবেশ স্বভাবতঃই আমাদের মনকে গড়ে তুলতে সহায়তা করে। পারিবারিক পরিবেশের মধ্যে আমাদের মন শৈশবে যেমন বিকশিত হয়, ঠিক তেমনিভাবেই বিকশিত হয় আমাদের মন সামাজিক পরিবেশ থেকে। চিত্তরঞ্জন যে কালে জন্মগ্রহণ করে-ছিলেন, বাংলার ইতিহাসে সেটা চিহ্নিত হয়ে আছে নবজাগরণের স্বর্ণযুগ বলে। সেই যুগের কথা এখানে একটু বলা দরকার।

সেই যুগটা ছিল বাঙালীর নবজন্মলাভের যুগ।

কত ধর্মবীর আর কর্মবীর জন্মেছিলেন সেই যুগে!

ধর্ম, কর্ম, শিক্ষা, শিল্প ও সাহিত্য—সকল দিক দিয়েই তখন দেশে দেখা গিয়েছিল একটা বিরাট জাগরণ। বাংলার আকাশে তখন যেন চাঁদের হাট বসেছিল—কত মনীষী, কত প্রতিভা আলো ঢেলে দিয়েছেন যেন। বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ, মাইকেল, কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, সুরেন্দ্রনাথ, রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র—এই সবের প্রতিভার প্রভায় বাংলা দেশ যেন ঝলমল করছিল। এঁদেরই চিন্তার অমৃত ধারায় সার্থক হয়েছিল এই নবজাগরণ। এঁদেরই কর্মসাধনা এনে দিয়েছিল বাঙালীর অন্তরে একটা নতুন প্রেরণা।

প্রথমে শাঁখ বাজালেন রামমোহন।

তিনিই আমাদের ঘুম ভাঙালেন—তিনিই আমাদের এনে দাঁড় করালেন আধুনিকতার রাজপথে। তারপর ঘটল নবীন বাংলার অভ্যুদয়। অচলায়তন সমাজদেহে দেখা দিল একটা প্রবল গতিবেগ। প্রাচীন ও নবীনের মধ্যে লাগল সংঘর্ষ। কিন্তু যুগের হাওয়া তখন অন্যদিকে—জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিকে—বইতে শুরু করছে। অন্ধ কুসংস্কার আর অর্থহীন আচার-আচরণ থেকে মুক্ত হলো বাঙালীর মন। গদ্যে এল নতুন ধাঁচ, কাব্যে নতুন প্রাণ। আত্ম-বিস্মৃত বাঙালীকে তার মর্মদর্শন করালেন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বঙ্গদর্শনের মধ্য দিয়ে। রঙ্গলাল, হেমচন্দ্রের কবিতায় শোনা গেল দেশপ্রেমের দীপক রাগিণী। মধুকবির কাব্যে জাগল প্রাণের দুর্বার তেজ।

তারপর ঋষি বঙ্কিম দিলেন জাগরণের মহামন্ত্র—বন্দেমাতরম্।

ইতিহাসের সে এক শুভলগ্ন। এই মন্ত্রই তো দিল আমাদের মুক্তির সন্ধান। এইভাবে উনিশ শতকে বাঙালীর জীবনের সর্বক্ষেত্রে যে প্রাণচাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল, তার সকল কথা তোমরা বড়ো হয়ে জানবে, পড়বে। এখন শুধু এই কথাটি মনে রেখো যে, বাংলার দিকে দিকে যখন নবজাগরণের শঙ্খধ্বনি প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল, বাংলার

আকাশে-বাতাসে যখন নতুন প্রাণস্পন্দন শোনা যাচ্ছিল—তখন ইতিহাসের এক শুভলগ্নেই ১৮৭০ সালের ৫ই নভেম্বর, শনিবার পটলডাঙায় যে ক্ষণজন্মা শিশু জন্মগ্রহণ করেছিল, সে যে সেই যুগেরই একটি বহু-প্রত্যাশিত অতিথি—এই কথাটি তোমরা বিশেষভাবে মনে রাখবে। এই যুগ থেকেই ভবিষ্যতের দেশবন্ধু আহরণ করেছিলেন প্রাণরস। মোট কথা, নবজাগরণের পরিণত যুগেরই একটা উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন।

যথাসময়ে লণ্ডন মিশনারি স্কুলে ভর্তি হলেন চিত্তরঞ্জন।

তখন ভবানীপুর অঞ্চলে এইটাই ছিল নাম-করা স্কুল। এখন এই স্কুলটি আর নেই। বালক চিত্তরঞ্জন যখন এই স্কুলে ভর্তি হন, তখন এ্যাস্টন সাহেব ছিলেন অধ্যক্ষ আর ফার্কুহার সাহেব ছিলেন ইংরেজীর অন্যতম শিক্ষক। ১৮৭৮ সালে এই স্কুলে শুরু হয় চিত্তরঞ্জনের ছাত্রজীবন। এখানে তিনি পড়েছিলেন আট বছর। তাঁর জীবনের একটি ঘটনা এখানে বলি :

চিত্তরঞ্জন তখন প্রথম শ্রেণীর ছাত্র।

তাঁর মতো ইংরেজী বলতে আর ইংরেজী কবিতা আবৃত্তি করতে ক্লাশের খুব কম ছেলেই পারত। একদিন ফার্কুহার সাহেব ছাত্রদের বায়রনের একটি কবিতা পড়াচ্ছিলেন। কবিতাটির নাম 'সনেট অন চিলন্'।

শিক্ষকমশাই প্রথমে কবিতাটি পড়ে গেলেন। তারপর কবিতাটির প্রতিটি ছত্র ব্যাখ্যা করলেন। ছেলেরা মন দিয়ে শোনে। পেন্সিল দিয়ে কেউ কেউ খাতায় অর্থ লিখে নেয়। কবিতাটির প্রথম চার লাইন :

Eternal spirit of the chainless Mind !
Brightest in dungeons, Liberty ! thou art—

For there thy habitation is the heart—
The heart which love of Thee alone can bind ;

এই চারটি লাইন ও তার অর্থ যেন বালক চিত্তরঞ্জনের মনের মধ্যে গেঁথে গিয়েছিল। কবিতাটি তাঁর কণ্ঠস্থ হয়ে গিয়েছিল। কিশোর বয়সের কল্পনায় তিনি নিজেকেই মনে করতেন যেন শৃঙ্খল-মুক্ত একটি আত্মা—যে আত্মা নিত্যকাল চলেছে স্বাধীনতার অভিসারে।

একদিন সকালবেলায় যখন তিনি কবিতাটি উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি করছিলেন, তখন তাঁর জ্যাঠামশাই দুর্গামোহন শুনতে পান।

এলেন তিনি ভাইপোর পড়ার ঘরে। দেখলেন চিত্ত তন্ময় হয়ে আবৃত্তি করছে বায়রনের সেই কবিতাটি।

চিত্ত! ডাকলেন তিনি কাছে এসে।

কিশোরের চমক ভাঙে। তাকিয়ে দেখেন সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর মেজ জ্যাঠামশাই। কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হয়ে তিনি বললেন, আমায় ডাকছিলেন জ্যাঠামশাই ?

—না। তোমার সুমিষ্ট কণ্ঠে এই ইংরেজী কবিতাটি শুনতে খুব ভাল লাগল। আবৃত্তি করছ কিন্তু এর মানে বুঝেছ ?

—হাঁ জ্যাঠামশাই। মাস্টারমশাই খুব ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

—বড়ো হয়ে তুমি কবির কল্পনাকে সার্থক করো—স্বাধীনতাপ্রিয় হও—এই আমার আশীর্বাদ রইল।

জ্যাঠামশাই চলে গেলেন।

কিন্তু দৈববাণীর মতোই তাঁর মুখ দিয়ে সেদিন বেরিয়েছিল এই কয়টি কথা। কিশোর চিত্তরঞ্জনের জীবনে উত্তরকালে এ স্বপ্ন কি রকম সার্থক হয়েছিল···তা তোমরা পরে জানতে পারবে।

এমনি স্বাধীনতাপ্রিয় তিনি হয়ে উঠেছিলেন যে, আমাদের

স্বাধীনতা-সংগ্রামে তাঁর মতো বীরযোদ্ধা দ্বিতীয় আর কেউ হতে পারেননি।

স্কুল-জীবনে সকল বিষয়েই চিত্তরঞ্জন ছিলেন তাঁর সহপাঠীদের অগ্রণী। শান্ত ও নিরীহ প্রকৃতির ছেলে তিনি ছিলেন না। তিনি ছিলেন অফুরন্ত প্রাণশক্তিতে ভরপুর। তাঁরই এক সহপাঠী লিখেছেন: "তীক্ষ্ণবুদ্ধির প্রাচুর্য আর মনের সজীবতা চিত্তকে যেন আমাদের সকলের আকর্ষণীয় করে তুলেছিল। তাঁকে আমরা দেখতাম সদা উৎফুল্ল—তার পাশে বসলেই আমরা অনুভব করতাম একটা সজীবভাব।"

সজীবতা ও আকর্ষণীশক্তি—এ দুটোই যেন ছিল তাঁর সহজাত। ভগবান তাঁর স্বভাবের মধ্যে এই দুটি বিশেষ গুণ দিয়ে যেন চিত্তরঞ্জনকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন। এই গুণের জন্যই তো উত্তরকালে তিনি সকলের চিত্তকে আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন। সকল মানুষের মধ্যে গুণ থাকে না, যাঁদের মধ্যে থাকে তাঁরাই তো মহাপুরুষ। নিঃসন্দেহে চিত্তরঞ্জন ছিলেন এমনি একজন চিত্তজয়ী মহাপুরুষ। বাংলার মাটিতে এমন মানুষ খুব বেশী জন্মগ্রহণ করেনি।

১৮৮৬ সাল।

চিত্তরঞ্জন এনট্রান্স পরীক্ষায় পাস করে ভর্তি হলেন প্রেসিডেন্সী কলেজে। বাংলা দেশের বহু মনীষী এই শিক্ষায়তনের ছাত্র ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে সুভাষচন্দ্র—বাংলার অনেক সুসন্তানকে ছাত্ররূপে পেয়ে কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের এমন সুনাম, ভারতবর্ষের আর কোন শিক্ষানিকেতন সম্পর্কে ঠিক এমন কথা বলা চলে না। সেই প্রেসিডেন্সী কলেজে ছাত্র হয়ে এলেন চিত্তরঞ্জন। তখন অধ্যক্ষ ছিলেন স্বনামধন্য ডক্টর পি. কে. রায়।

১৮৯০।

বি. এ. পাস করলেন চিত্তরঞ্জন।

যে চার বছর তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়েছিলেন, সেই সময়ে অধ্যয়নের মধ্যেই তাঁর মনোযোগ সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং পড়াশুনা তিনি কমই করতেন। কলেজের বিতর্কসভা ও ছাত্রসভার কাজকর্ম নিয়েই বেশীর ভাগ সময় তিনি মেতে থাকতেন। ইংরেজী ভাষা তিনি ভালভাবেই আয়ত্ত করেছিলেন। মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগও বড়ো কম ছিল না। এই প্রসঙ্গে তাঁর কলেজ-জীবনের একটি ঘটনা উল্লেখ করা দরকার। উত্তরকালে যে চিত্তরঞ্জন মনে-প্রাণে একজন খাঁটি বাঙালী হয়ে উঠেছিলেন, ছাত্রাবস্থায় বাংলা ভাষার প্রতি তিনি যে অনুরাগ প্রদর্শন করবেন, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

কলেজে পৃথ্বীশচন্দ্র রায় ছিলেন তাঁর সহপাঠী। উত্তরকালে ইনি একজন সাংবাদিকরূপে বিখ্যাত হন। শুধু সহপাঠীই নন, পৃথ্বীশচন্দ্র চিত্তরঞ্জনের আজীবন বন্ধু ছিলেন। তখন প্রেসিডেন্সী কলেজে আণ্ডার-গ্রাজুয়েট্স্ অ্যাসোসিয়েসন নামে এক সমিতি ছিল। চিত্তরঞ্জন ও পৃথ্বীশচন্দ্র সেই সমিতির পক্ষ থেকে একটা বলিষ্ঠ আন্দোলন গড়ে তোলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা ভাষাকে প্রবেশিকা ও ফার্স্ট আর্টস্ পরীক্ষায় বিকল্প দ্বিতীয় ভাষার স্থান দেবে না কেন?—এই ছিল সমিতির বক্তব্য। আন্দোলন অবশ্য তখনি ফলবতী হয়নি, তবে এ থেকে বাংলা ভাষার প্রতি চিত্তরঞ্জনের যে অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছিল তা বৃথা হয়নি। চিত্তরঞ্জনের সাহিত্য-সাধনা এখন থেকে প্রকাশ পায়।

চিত্তরঞ্জন বি. এ. পাস করলেন।

মেজ জ্যাঠামশাইয়ের ইচ্ছা তিনি ব্যারিস্টারি পড়েন। কিন্তু

পিতার ইচ্ছা পুত্র আই. সি. এস্. পড়ুক। এর অবশ্য একটা কারণ ছিল। ভুবনমোহন তখন ঋণভারে জর্জরিত। পুত্র যদি সিভিলিয়ান হতে পারে, তবে আর্থিক দুশ্চিন্তা থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়। এই রকম চিন্তা করেই ভুবনমোহন তাঁর অগ্রজকে বললেন, চিত্ত আই. সি. এস্.-ই পড়ুক।

আই. সি. এস্. পড়তে বিলাতযাত্রা করলেন চিত্তরঞ্জন।

কিন্তু লণ্ডনে এসে তিনি রাজনৈতিক চর্চায় এমনভাবে মেতে উঠলেন যে, ১৮৯২ সালে উক্ত পরীক্ষায় তাঁর পক্ষে কৃতকার্য হওয়া সম্ভব হলো না। ভুবনমোহন পুত্রকে আবার পরীক্ষা দিতে নির্দেশ পাঠালেন। পরের বছর চিত্তরঞ্জন এই পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়েও ইণ্ডিয়ান্ সিভিল সার্ভিসে প্রবেশলাভ করতে পারলেন না। কারণ, ১৮৯৩ সালের পরীক্ষায় পঞ্চাশজনকে সার্ভিসে নেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু পরে ঘোষণা করা হয় যে, পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মধ্যে মাত্র চল্লিশজনকে নেওয়া হবে। সেই চল্লিশজনের তালিকায় চিত্তরঞ্জনের নাম ছিল না। অতঃপর চিত্তরঞ্জন ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৮৯৩ সালে দেশে ফিরেন এবং কলকাতা হাইকোর্টে যোগ দিলেন।

তখন তাঁর বয়স মাত্র তেইশ।

৩

হাইকোর্টে চিত্তরঞ্জন প্র্যাক্‌টিস্ আরম্ভ করলেন।

প্রথম প্রথম কিছুতেই সুবিধা করতে পারলেন না।

কিছুতেই পসার জমে না। পসার না জমবার একটা প্রধান কারণ, তিনি দেউলিয়া এ্যাটর্নি ভুবনমোহন দাশের ছেলে। জুনিয়র উকিল-ব্যারিস্টারদের ভাগ্যে যা ঘটে থাকে, তরুণ ব্যবহারজীবী চিত্তরঞ্জনের ভাগ্যেও তাই ঘটল। ব্রীফলেস ব্যারিস্টার।

তখন কত নাম-করা দিকপাল ব্যারিস্টার হাইকোর্টে। তাঁদের বাদ দিয়ে কোন মক্কেলই জুনিয়রদের মামলা দিতে নারাজ। বছরের পর বছর কেটে যায়। চিত্তরঞ্জনের পসার আর জমে না। প্রতিদিন বাড়ী থেকে হাইকোর্টে আসেন, বার-লাইব্রেরীতে বসেন ও তারপর বিকেলবেলায় শূন্যহাতে ভারাক্রান্ত মনে বাড়ী ফিরেন। সাফল্যের কোন আশাই দেখা যায় না। এমন দিনও এসেছে যেদিন পয়সার অভাবে তিনি ময়দানের উপর দিয়ে পায়ে হেঁটে বাড়ী ফিরেছেন।

না, এভাবে থাকলে চলবে না।

যেমন করেই হোক টাকা রোজগার করতে হবে—রোজগার করতে হবে পিতাকে ঋণমুক্ত করার জন্য। তখন চিত্তরঞ্জন কলকাতার বাইরে মফঃস্বলে দু'একটা ছোটখাটো মামলা নিলেন। সামান্য কিছু রোজগারও হতে লাগল। কিন্তু বাবার ঋণ পরিশোধ করবার মতো রোজগার তখনো পর্যন্ত হয়নি। হাইকোর্টে চিত্তরঞ্জন আদিম বিভাগে যখন পসার জমাতে ব্যর্থকাম হলেন, তখন তিনি

মফঃস্বল কোর্টে ফৌজদারী মামলা করতে আরম্ভ করেন, মাসে তিনশো-চারশো টাকা উপায় হতে লাগল। কিন্তু অতবড় সংসার, তার উপর পিতার বিপুল ঋণের বোঝা তাঁর মাথায়, রোজগার প্রচুর না হলে তো তাঁর চলবে না।

এইভাবে সংগ্রাম চলে।

আশা-নৈরাশ্যের মধ্য দিয়ে কর্মজীবনে এগিয়ে চলেন তিনি।

প্রতিকূল অদৃষ্টের কাছে কিছুতেই হার মানবেন না।

নিজের পুরুষকারের উপর নির্ভর করে বহুবিধ বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়ে তাঁর জীবনের জয়রথ চালিয়ে দিয়েছিলেন চিত্তরঞ্জন। এই সময়ে—তাঁর কর্মজীবন শুরু হওয়ার তিন বছর পরে ১৮৯৭ সালে—তাঁর জীবনসঙ্গিনী হয়ে এলেন বাসন্তী দেবী। তিনি ছিলেন বরদানাথ হালদারের বড়মেয়ে। বরদানাথ ছিলেন আসামের কোন এক এস্টেটের দেওয়ান। রূপে-গুণে বাসন্তী দেবী ছিলেন চিত্তরঞ্জনের উপযুক্ত স্ত্রী। একান্নবর্তী দাশ-পরিবারের উপযুক্ত বধূরূপেই বাসন্তী দেবী এঁদের সংসারে প্রবেশ করেছিলেন। স্বামীর জীবনসংগ্রামে তিনি দিতেন উৎসাহ আর প্রেরণা। শত দুঃখ ও অভাবের মধ্যেও বাসন্তী দেবীর কখনো ধৈর্যচ্যুতি ঘটেনি, কিংবা মুখের হাসি ম্লান হয়নি। স্বামীর প্রতিভা ও পৌরুষের প্রতি ছিল তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা। সেই শ্রদ্ধা তিনি পোষণ করতেন নিঃশব্দে, সকলের অগোচরে। লক্ষ্মীস্বরূপিণী বাসন্তী দেবী দাশ-পরিবারে লক্ষ্মীপ্রতিমারূপেই প্রবেশ করেছিলেন। সেবায়, মমতায়, স্নেহে ও কর্তব্যাচরণে তিনি অল্পদিনের মধ্যেই সকলের চিত্ত জয় করেছিলেন—হয়ে উঠেছিলেন সকলের প্রিয়পাত্রী। এমন গুণবতী স্ত্রী লাভ করে চিত্তরঞ্জন নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করেছিলেন।

বছরের পর বছর কেটে যায়।

এমনিভাবে অতিক্রান্ত হলো দীর্ঘ বারোটি বছর।

এই বারো বছর কাল চিত্তরঞ্জনকে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করতে হয়েছিল ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রসন্নতা অর্জন করতে।

১৯০৫ সাল পর্যন্ত ব্যারিস্টার হিসাবে চিত্তরঞ্জন প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে সক্ষম হননি। অবসরকালে তিনি সাহিত্য-চর্চাও করতেন এবং কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। কিন্তু এক্ষেত্রেও তখনো পর্যন্ত তেমন প্রতিষ্ঠা তিনি লাভ করতে পারেননি। কবি চিত্তরঞ্জনের কথা, সাহিত্যিক চিত্তরঞ্জনের কথা পরে বলব, আপাততঃ আমরা ব্যারিস্টার সি. আর. দাশের কথাই বলি।

অবশেষে ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্নমনে ধরা পড়লেন কর্মযোগীর কাছে।

শরৎচন্দ্র সেন তখন আলিপুরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল এবং চিত্তরঞ্জনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। শুধু বন্ধু নয়, তার চেয়েও অনেক বেশী।

শরৎচন্দ্র সেন একদিন রসারোডে দাশ-বাড়ীতে এসে বললেন—চিত্ত, আমার হাতে কয়েকটা দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলা এসেছে। মামলাগুলি শীগগিরই হাইকোর্টে যাবে, আমার ইচ্ছা, তুমি আপিলের এই মকদ্দমাগুলি নাও, আমার মক্কেলরা সবাই রাজী।

চিত্তরঞ্জন যেন হাতে চাঁদ পেলেন।

হাইকোর্টে একসঙ্গে এতগুলো 'কেস' পাবেন, এ তাঁর স্বপ্নের অগোচর।

বন্ধুকে বললেন, "ভাই শরৎ, মফঃস্বলে ঘুরে ঘুরে তো হায়রানি আর রোজগারও তেমন কিছু নয়। হাইকোর্টে যদি একবার দাঁড়াতে পারি, আমার বিশ্বাস আমি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারব। তোমার এই উপকার আমি কখনো ভুলব না।" এই হলো ব্যারিস্টার-রূপে চিত্তরঞ্জনের সৌভাগ্যের সূচনা। বন্ধুর দেওয়া মামলা কয়টি খুব সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা করে তিনি পেলেন বিপুল খ্যাতি।

ব্যারিস্টার সি. আর. দাশ।

তখন থেকেই লোকের মুখে মুখে এই এক নাম।

কি ফৌজদারী, কি দেওয়ানী—সব মামলাতেই তিনি সব্যসাচী! তাঁর জেরার মুখে বিপক্ষের উকিল-ব্যারিস্টার স্তম্ভিত! তাঁর যুক্তি-পূর্ণ সওয়াল শুনে বিচারপতিরা বিস্মিত! আরও তাঁরা বিস্মিত হতেন তাঁর বাগ্‌ভঙ্গীতে।

১৯০৭ সাল থেকেই ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জনের খ্যাতি আরম্ভ। এই খ্যাতি তিনি লাভ করেছিলেন কয়েকটি বিখ্যাত রাজনৈতিক মামলা পরিচালনা করে। সেই মামলাগুলির মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল আলিপুর বোমার মামলা। এই মামলার প্রধান আসামী ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ। এই অরবিন্দের কথা এখানে একটু বলা দরকার।

অরবিন্দ ঘোষ (১৮৭২—১৯৫০) ছিলেন ঋষি রাজনারায়ণ বসুর দৌহিত্র। ইনি আবাল্য ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছিলেন এবং সাত বছর বয়স থেকে একাদিক্রমে চোদ্দ বছর কাল বিলাতে লেখা-পড়া শিখেছিলেন। তিনি কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। চিত্তরঞ্জন যখন বিলাতে ব্যারিস্টারি পড়তে গিয়েছিলেন, তখন সেখানে অরবিন্দের সঙ্গে তাঁর প্রথম আলাপ। সেই আলাপ বন্ধুত্বে পরিণত হয়। অরবিন্দ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিয়েছিলেন, কিন্তু ঘোড়ায় চড়ার পরীক্ষাটা দেননি, তাই তিনি আই. সি. এস্. হতে পারেননি।

ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও তাঁর হৃদয়-মন ছিল খাঁটি দেশ-প্রেমে ভরপুর। শৈশবকাল থেকেই তাঁর দাদামশাইয়ের কাছ থেকে অরবিন্দ এই ভাব লাভ করেছিলেন। স্বদেশকে তিনি মা বলে জানতেন এবং সেইভাবেই এ-কে ভক্তি করতেন, পূজা করতেন। তিনি নিজেই বলেছেন, "এই ভাব নিয়ে আমি জন্মেছিলাম, এই ভাব আমার জন্মগত।"

বিলাত থেকে ফিরে অরবিন্দ বরোদার রাজসরকারে চাকরি গ্রহণ করেন। ইংরেজ সরকারের চাকরি তিনি গ্রহণ করেননি। দেশীয় স্বাধীন রাজ্যগুলির মধ্যে বরোদা অন্যতম। এখানকার রাজার উপাধি ছিল গাইকোয়াড়। বরোদার মহারাজার সঙ্গে বিলাতেই তাঁর আলাপ হয় এবং মহারাজার অনুরোধেই তিনি প্রথমে তাঁর একান্ত সচিব, পরে বরোদা কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি ঐ কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। মাইনে তখন মাসে হাজার টাকার উপর।

অরবিন্দ যখন বরোদায় চাকরি করছিলেন, সেই সময়ে ভারতের বড়লাট ছিলেন লর্ড কার্জন। কার্জন বাংলা দেশকে ভেঙে দু'ভাগ করেছিলেন। এই ঘটনার প্রতিবাদে বাঙালী তখন যে বিরাট আন্দোলন' করেছিল, সেই আন্দোলনকে ইতিহাসে বলা হয় 'বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন বা 'স্বদেশী আন্দোলন'। এই আন্দোলনের পুরোভাগে যে সব নেতারা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, বিপিনচন্দ্র পাল, অশ্বিনীকুমার দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র ও শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী প্রভৃতি। এঁরা সবাই ছিলেন জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তখন বাংলা দেশে সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন মুকুটহীন রাজা। তাঁকেই বলা হয় জাতীয়তার জনক। তিনিই ভারতের রাষ্ট্রগুরু।

বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের অগ্নিশিখা বরোদার অরবিন্দকেও স্পর্শ করল। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমার ঘোষও তখন বরোদায় সেজদাদার কাছে। অরবিন্দ বারীন্দ্রকে প্রথমে বাংলা দেশে পাঠালেন। তিনি এসে দেখলেন বঙ্গভঙ্গকে উপলক্ষ করে এক প্রচণ্ড জাতীয় চেতনা বাঙালীর মনে জেগেছে। একদিকে রাষ্ট্রগুরুর কণ্ঠে শিবের বিষাণ—এ কার্জনী-বিধান আমরা রদ করবই—আর

অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে ঐক্যের সেই অপূর্ব সঙ্গীত—সব-কিছু মিলে যেন এক অগ্নিগর্ভ অবস্থার সৃষ্টি হলো সমগ্র বাংলায়। হাটে-বাজারে, শহরে-পল্লীতে উঠল 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি। সকলের মুখে এককথা—"ভাই-ভাই এক ঠাঁই, ভেদ নাই ভেদ নাই।" দেখতে দেখতে বাংলার ঘরে ঘরে অখণ্ড বাংলার মহারোল উঠল। সারা বাংলায় আগুন জ্বলল।

সেই আগুনে ঝাঁপ দিলেন অরবিন্দ।

বরোদার রাজকলেজ ছেড়ে তিনি এলেন বাংলা দেশে। এই সময়ে যে দুখানি কাগজ লক্ষ লক্ষ তরুণের প্রাণে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল, তাদের নাম হল 'যুগান্তর' আর 'সন্ধ্যা'। অগ্নিমন্ত্রের প্রচারে 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন বারীন্দ্রকুমার, আর 'সন্ধ্যা' ছিল উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের কাগজ। 'সন্ধ্যা'র ছত্রে ছত্রে প্রচার হতে লাগল ইংরেজ-বিদ্বেষ। এই যুগেই কলকাতায় স্থাপিত হয় বিখ্যাত 'অনুশীলন-সমিতি'। বাংলা দেশে বিপ্লবের বেদী রচিত হয়েছিল এই সমিতিতেই—চিত্তরঞ্জন এই সমিতির সঙ্গে প্রথম থেকেই যুক্ত।

অরবিন্দ বাংলা দেশে আসার পর থেকে বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লব আন্দোলন আরো সংহত হয়ে উঠতে থাকে। তিনি প্রাচীনপন্থী নেতাদের আবেদন-নিবেদনের নীতিতে বিশ্বাস করতেন না। ইংরেজকে আঘাত হানতে হবে, ইংরেজের রাষ্ট্রযন্ত্রকে অচল করতে হবে, তবেই না দেশ স্বাধীন হবে। কলকাতায় এসেই তিনি ইংরেজী ভাষায় মুদ্রিত 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় এইসব কথা প্রচার করতে আরম্ভ করেন। শাসকবর্গ চিন্তিত হলো। 'যুগান্তর' ও 'সন্ধ্যা' কাগজের সঙ্গে এসে কণ্ঠ মিলাল 'বন্দেমাতরম্'। এই 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন তিনজন—বিপিনচন্দ্র, শ্যামসুন্দর ও অরবিন্দ। সারা ভারতবর্ষে সেদিন স্বাধীনতার বার্তা প্রচার

করে 'বন্দেমাতরম্' যুগান্তর এনেছিল বললেই হয়। ভারতবর্ষে পরাধীনতার যুগে অনেক কাগজ হয়েছে, কিন্তু বন্দেমাতরমের মতো এমন নির্ভীক পত্রিকা আর দ্বিতীয় হয়নি।

অরবিন্দ বাংলা দেশে আসার পর থেকেই সশস্ত্র বিপ্লব আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠতে থাকে। স্বদেশী আন্দোলনের পাশাপাশি চলেছিল এই বিপ্লব আন্দোলন। যে বাঙালীর এত কাল ভীরু কাপুরুষ বলে অপবাদ ছিল, সেই বাঙালীর ছেলে যে বোমা তৈরি করবে, রিভলবার ছুঁড়বে—এ ছিল শাসকজাতির কল্পনার বাহিরে। কলকাতায় এই বিপ্লব-দুর্গ রচিত হয়েছিল মানিকতলার মুরারিপুকুর বাগানে। হেম দাস বোমা তৈরি করতেন। তাঁরই তৈরী দুটি বোমা নিয়ে দুটি তরুণ—ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল—একদিন মুরারিপুকুর থেকে যাত্রা করল মজঃফরপুরে। উদ্দেশ্য—অত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেট কিংস্‌ফোর্ডকে হত্যা করা। প্রস্থানকালে অরবিন্দ তাদের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন।

১৯০৮, ১লা মে।

বৈশাখের উজ্জ্বল প্রভাত।

সেদিনের প্রভাতী সংবাদপত্রে বাঙালী সবিস্ময়ে পাঠ করল মজঃফরপুরে বোমা ফাটার সংবাদ। উৎসাহে তাদের হৃদয় নেচে উঠল। পরে জানা গিয়েছিল যে, সেই বোমায় কিংস্‌ফোর্ড নিহত হননি, নিহত হয়েছিল দুজন ইংরেজ মহিলা। ২রা মে মুরারিপুকুর বাগান ঘেরাও করে চৌত্রিশ জন বিপ্লবীকে ধরা হলো। গ্রে স্ট্রীট থেকে ধরা পড়লেন 'বন্দেমাতরম্' দৈনিক কাগজের প্রাণপুরুষ, বিপ্লবের রণগুরু, জাতীয়তার মহান্ ঋষি অরবিন্দ। এই সংবাদ দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল সারা দেশে। অমনি বাংলার আকাশে-বাতাসে

জ্বলে উঠল আগুন—নিশ্বাসে নিশ্বাসে উত্তপ্ত হলো বাঙালীর প্রাণ। দেশবাসী জানল—শুনল বাংলার বিরাট বৈপ্লবিক আন্দোলনের কথা।

মানিকতলার বাগানে আবিষ্কৃত হলো বিপ্লবের দুর্গ।

দেশময় ছড়িয়ে পড়ল উত্তেজনার আগুন।

এইভাবেই সেদিন শুরু হয়েছিল আলিপুর বোমার মামলা।

অরবিন্দ ঘোষ ছিলেন এই মামলার প্রধান আসামী।

তাঁকেই সমর্থন করতে এগিয়ে এলেন ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ। তাঁর ব্যারিস্টারি প্রতিভার একটা উদ্ভাসন দেখা গিয়েছিল এই মামলায় আসামী পক্ষের কৌঁসুলিরূপে। এই মামলার পর থেকেই ব্যারিস্টার সি. আর. দাশের জীবনে সূচিত হয় দিক-পরিবর্তন সেই স্মরণীয় ১৯০৮ সাল থেকেই। একদিকে অরবিন্দ ঘোষ, অন্যদিকে তাঁর কৌঁসুলি চিত্তরঞ্জন দাশ—বাংলা তথা ভারতের এই দুই স্বদেশপ্রেমিকের নামের সঙ্গে জড়িত হয়ে আলিপুর বোমার মামলা আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে একটা বিশেষ গৌরব লাভ করেছে। এই মামলাকে উপলক্ষ করেই চিত্তরঞ্জন স্বদেশপ্রেমের একটা নতুন সংহিতা রচনা করেছিলেন সেদিন। তার মূল্য আজো হারায়নি।

আলিপুরের দায়রা জজ বীচক্রফ্‌টের এজলাসে এই মামলা চলেছিল এক বছর। অরবিন্দ ছাড়া আরো ত্রিশ-চল্লিশজন বিপ্লবী এই মামলার আসামী ছিলেন। সকলের বিরুদ্ধেই পুলিশ নিয়ে এলো রাজদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগ। মামলার শুনানি আরম্ভ হয় ১৯০৮ সালের অক্টোবর মাস থেকে। সরকারপক্ষ থেকে দাঁড়িয়ে-ছিলেন তখনকার অনেক নাম-করা উকিল-ব্যারিস্টার। তাঁদের মধ্যে ব্যারিস্টার নর্টন সাহেব ছিলেন প্রধান। জাঁদরেল ব্যারিস্টার। সারা ভারতবর্ষের দৃষ্টি তখন এই মামলার উপর—এই মামলার প্রধান আসামী অরবিন্দ ও তাঁর কৌঁসুলি চিত্তরঞ্জের উপর নিবদ্ধ হয়েছে।

চিত্তরঞ্জন কোন পারিশ্রমিক না নিয়েই এই মামলায় দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর এই মহত্ত্ব দেখে সবাই বিস্মিত হলো। যেমন করেই হোক অরবিন্দকে খালাস করে আনতে হবে—এই ছিল তাঁর সংকল্প।

দিনের পর দিন, রাতের পর রাত চলল দুষ্কর সাধনা।

চলল অমানুষিক পরিশ্রম আর অধ্যয়ন।

মামলার রাশিকৃত নথিপত্রের মধ্যে ডুবে রইলেন চিত্তরঞ্জন।

সংসার আছে কি নেই, তার হুঁশ পর্যন্ত নেই। সঞ্চিত অর্থ যখন ফুরিয়ে এলো, নিজের জুড়িগাড়িটা পর্যন্ত বিক্রি করে দিলেন। সেই টাকাও যখন নিঃশেষিত হলো, কাটলেন হ্যাণ্ডনোট। এমনিভাবে পঞ্চাশ হাজার টাকা ঋণগ্রস্ত হয়েছিলেন চিত্তরঞ্জন এই মামলায় দাঁড়িয়ে। এ কী কম ত্যাগের কথা! পৃথিবীতে এমন কথা কেউ কখনো শুনেছে যে, তাঁর মক্কেলের জন্য কোন আইনজীবী কখনো ঋণগ্রস্ত হয়েছেন?

আর কী গভীর সাধনজ্ঞানের পরিচয় তিনি দিয়েছিলেন এই মামলা পরিচালনা করবার সময়। এই মামলা চলবার সময়ের একটি ঘটনার উল্লেখ করতে হয়। একদিন কি একটা আইনের খুঁটিনাটি নিয়ে চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে বিচারক বীচক্রফ্‌টের মধ্যে কথা কাটাকাটি হলো। কিছুক্ষণ তর্কবিতর্কের পর হাকিমের মেজাজ গরম হলো। রাগের মাথায় তিনি বলে উঠলেন, আপনি বাজে কথা বলছেন, মিঃ দাশ।

এজলাস-সুদ্ধ সবাই—আসামী ও দর্শক—তাকিয়ে দেখল যে, এই কথা শোনামাত্র চিত্তরঞ্জনের মুখেচোখে এমন একটা ভাব ফুটে উঠল যা ঝড়ের আগে মেঘের কথা মনে করিয়ে দেয়। আইনের পুঁথিপত্র বন্ধ করে বুক ফুলিয়ে একেবারে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন চিত্তরঞ্জন। মুষ্টিবদ্ধ ডানহাতখানা তুলে দৃপ্তকণ্ঠে তিনি হাকিমের দিকে তাকিয়ে

বললেন—এটা বিচারালয়, এখানে ঐ রকম ভাষা আপনার মুখ দিয়ে বের হওয়া উচিত নয়। এই কথা আপনি যদি আদালতের বাইরে অন্য কোথাও আমাকে বলতেন তাহলে আমি এর সমুচিত জবাব আপনাকে দিতাম।

বীচক্রফ্‌ট সাহেব স্তম্ভিত।

দিন যায়। আলিপুর বোমার মামলার শুনানি শেষ হয়ে আসে। শেষের নয় দিন—১৯০৯ সালের ২৩শে মার্চ থেকে ৩১শে মার্চ—চিত্তরঞ্জন যে সওয়াল করলেন তা ইতিহাসে এক নজীর সৃষ্টি করল। যেমন তার ভাষা, তেমনি তার যুক্তি। যুক্তির সঙ্গে ছিল আবেগ। সওয়ালের শেষদিনে প্রচুর জনসমাগম হয়েছিল। এজলাসের কাজ আরম্ভ হলো যথাসময়ে। চিত্তরঞ্জন উঠে দাঁড়ালেন। তারপর জলদগম্ভীরস্বরে তিনি কখনো বিচারক, কখনো বা জুরিদের লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন :

'আপনাদের সামনে আমি শুধু এইটুকু নিবেদন করছি, এর পরে যখন সমস্ত বাদানুবাদ থেমে যাবে, যখন নিস্তব্ধ হয়ে যাবে এইসব কোলাহল ও বাদানুবাদ—এই আসামী অরবিন্দ ঘোষও যখন এ পৃথিবীতে থাকবেন না, তারও পরে, বহুকাল পরে জগতের লোক বলবে যে, এই আসামী ছিলেন দেশপ্রেমের এক অমর কবি, জাতীয়তার অগ্রদূত আর সমস্ত মানবজাতিকে তিনি ভালবাসতেন। একদিন এঁর বাণী কেবল ভারতের মধ্যেই নয়, এদেশ ছাড়িয়ে দূর-দূরান্তেরও সাগরপারে সকল দেশে ব্যাপ্ত হয়ে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হবে।'

উপস্থিত সকলে নিরুদ্ধ নিশ্বাসে শুনল এই সওয়াল।

১৩ই এপ্রিল জুরিরা জানালেন প্রধান আসামী নির্দোষ।

৬ই মে বীচক্রফ্‌ট রায় দিলেন—প্রধান আসামীর বিরুদ্ধে কোন

অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। আইনের চক্ষে তিনি কোন অপরাধ করেননি। তাঁকে আমি সসম্মানে মুক্তি দিলাম।

তখন এজলাস থেকে বিজয়ী বীরের মতো বন্ধুর হাত ধরে বেরিয়ে এলেন চিত্তরঞ্জন। আলিপুর বোমার মামলার ফলাফলই তাঁকে দাঁড় করিয়ে দিল সৌভাগ্যের উচ্চ সোপানে। ভাগ্যলক্ষ্মী হলেন প্রসন্ন। দৈব ও পুরুষকারের সমাবেশ ঘটল এইবার তাঁর জীবনে। অমনি তাঁর জীবনের জয়রথ তখন থেকে ছুটে চলল অপ্রতিহত বেগে।

১৯০৭ সাল থেকে বাংলা দেশে যতগুলি বিখ্যাত রাজনৈতিক মামলা হয়েছিল, তার প্রত্যেকটিতে আসামীর পক্ষে দাঁড়াতেন চিত্তরঞ্জন। দাঁড়াতেন তিনি সব্যসাচীর মতো। দাঁড়াতেন সম্পূর্ণ বিনা পারিশ্রমিকে। তখন থেকেই কি ফৌজদারী, কি দেওয়ানী—দুরকম মকদ্দমাতেই তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল সারা ভারতবর্ষে। ব্যবহারজীবীদের মধ্যে তিনি অধিকার করলেন শীর্ষস্থান। তখন চিত্তরঞ্জনই সারা ভারতবর্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যারিস্টার হিসাবে গণ্য হয়েছিলেন।

এর পর তিনি যে দেওয়ানী মামলায় অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিলেন, তার নাম ডুঁমরাঁও মামলা। ভারতবর্ষে দেওয়ানী মামলার ইতিহাসে এতবড়ো মামলা আজ পর্যন্ত আর হয়নি। যেমন জটিল তেমনি দীর্ঘস্থায়ী ছিল এই মামলা। এই মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ

বিহারের একটি ছোট্ট রাজ্য ডুঁমরাঁও। স্যর রাধাপ্রসাদ সিংহ এই রাজ্যের মহারাজা। তিনি মারা যান অপুত্রক অবস্থায়। তখন গদির উত্তরাধিকার নিয়ে বাধল গোলমাল। মহারাজার বড়ো মেয়ের বিয়ে হয়েছিল মান্দারের রাজার সঙ্গে। বিয়ের অল্পকাল পরে অপুত্রক রাজার মৃত্যু হয়। মহারাজার মেজ মেয়ের বিয়ে হয় রেওয়ার রাজার সঙ্গে।

মারা যাওয়ার আগে মহারাজা একটা দলিল করে যান। সেই

দলিলে বলা হয়, তাঁর স্ত্রী একটি দত্তক পুত্র গ্রহণ করতে পারবেন। কিন্তু দত্তক গ্রহণ করতে হবে তিনটি পরিবারের যে-কোন একটি থেকে। পরিবার তিনটির নাম দলিলে উল্লিখিত হয়—বক্সার, জগদীশপুর অথবা উজ্জয়িনী। এই উইল সম্পাদিত হয় ১৮৮৯ সালে ও কলকাতায় তা বিধিবদ্ধ হয়। মহারাজার মৃত্যুর ছ-সাত বছর বাদে ডুঁমরাঁও-র মহারানী জগদীশপুরের জমিদার জয়প্রসাদ সিংহের নাবালক পুত্র জংবাহাত্বরকে যথারীতি দত্তক গ্রহণ করেন। রানী এই দত্তক গ্রহণ করেন তাঁর মৃত্যুর ঠিক একদিন আগে। এভাবেই জংবাহাত্বর ডুঁমরাঁও-র গদির ভাবী উত্তরাধিকারী হন ও তখন তাঁর নাম রাখা হয় মহারাজকুমার শ্রীনিবাসপ্রসাদ সিংহ। মহারানীর মৃত্যুর পরে ডুঁমরাঁও সরকারী তত্ত্বাবধানে আসে।

তারপর মহারাজার এক নিকটতম আত্মীয় দত্তক অবৈধ বলে একটি মামলা দায়ের আনেন। তাঁর নাম কেসোপ্রসাদ সিংহ। তিনি যখন মামলা দায়ের করা স্থির করেন, তখন কোন উকিল-ই রাজী হয়নি তাঁর পক্ষে দাঁড়াতে। সবাই বললো—এ মামলায় জয়লাভের আশা নেই। তখন কেসোপ্রসাদ কলকাতায় এসে চিত্তরঞ্জনকে ধরলেন। মাসিক দশ হাজার টাকা পারিশ্রমিকে তিনি বাদীর পক্ষ সমর্থনে রাজী হলেন। অপূর্ব আইনজ্ঞানের পরিচয় তিনি দিয়েছিলেন এই মামলায় এবং শেষ পর্যন্ত জয়লাভও করতে সমর্থ হন। ফলে, এক পথের ভিখারী রাজগদিতে বসতে সক্ষম হয়েছিলেন।

তাঁর কর্মজীবনের শেষের বারোটি বছরই ছিল সবচেয়ে গৌরবজনক। এই বারো বছর কাল কলকাতা ও বাইরের ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলায় চিত্তরঞ্জন তাঁর প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। এই সময়ে তাঁর মাসিক আয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকায়। তখনকার দিনে ভারতবর্ষে আইন-ব্যবসায়ে আর

কেউ তাঁর সমকক্ষ ছিলেন না বললেই হয়। মক্কেলের মামলা নিয়ে তিনি যে রকম আন্তরিকতার সঙ্গে মামলার নথিপত্র দেখতেন, তাতে সবাই চমৎকৃত হতো। এই যে সাফল্যলাভ তিনি করেছিলেন, এর মূলে শুধু তাঁর প্রখর আইনজ্ঞানই ছিল না—ছিল প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব আর ছিল তাঁর অপূর্ব বাগ্‌ভঙ্গী। আদালতে দাঁড়িয়ে তিনি যখন সওয়াল করতেন, তখন চিত্তরঞ্জনের সুমিষ্ট অথচ দৃপ্ত বাগ্‌ভঙ্গিমা শুনে সবাই চমৎকৃত হতো। পারিশ্রমিকের দিকে না তাকিয়ে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমে মামলা পরিচালনা করতেন—সমস্ত মন-প্রাণ ঢেলে দিতেন। কখনো কোন হাকিমের কাছ থেকে তিনি তাঁর মক্কেলের জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করতেন না। আইনের আশ্রয় নিয়েই তিনি দাঁড়াতেন সব্যসাচীর মতো। এমনি প্রত্যয় আর নিষ্ঠা ছিল বলেই না চিত্তরঞ্জন তাঁর সময়ে একজন দিকপাল আইনজীবী বলে সারা দেশে গণ্য হয়েছিলেন।

৪

লক্ষ্মী পাতলেন তাঁর সোনার পদ্মের আসন ১৪৮ নম্বর রসা-রোড়ের বাড়ীতে। সেই সঙ্গে বীণাপাণিরও চরণপদ্ম পড়ল সেখানে। লক্ষ্মী ও সরস্বতীর সেবায় সার্থক হয়ে উঠল চিত্তরঞ্জনের জীবন। মামলার নথিপত্র দেখার পর সামান্য অবসর পেলে তা বৃথা নষ্ট করতেন না।

আইন ছিল তাঁর পেশা, আর সাহিত্য ছিল তাঁর প্রাণ। কবিপ্রতিভা ছিল তাঁর জন্মগত। কর্মজীবনে প্রবেশ করে তিনি কাব্যচর্চা করে নির্মল আনন্দ পেতেন। সেই কবি ও সাহিত্যিক চিত্তরঞ্জনকে না জানতে পারলে তাঁর জীবনের অন্য একদিক জানা যাবে না। এইবার আমরা তাঁর জীবনের সেই অধ্যায়টির কথা বলব।

প্রথমে চিত্তরঞ্জনের জীবনের সবচেয়ে গৌরবময় ঘটনাটি উল্লেখ করতে হয়। আগেই বলেছি, তাঁর পিতা ঋণগ্রস্ত হয়ে সেই ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম হয়ে দেউলিয়া আদালতের আশ্রয় নিয়েছিলেন। বিলাত থেকে ব্যারিস্টারি পাস করে ফিরে এসে চিত্তরঞ্জন তাঁর পিতাকে ঋণমুক্ত করার কথা সর্বদা চিন্তা করতেন। কর্মক্ষেত্রে নেমে প্রথম কয়েক বছর চিত্তরঞ্জনকে প্রতিকূল ভাগ্যের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছিল। তখন উপার্জনও আশানুযায়ী হত না। ঋণ পরিশোধের পথও ছিল না। সেইজন্য ১৯০৬ সালে বৃদ্ধ পিতা ও পুত্রকে একসঙ্গে দেউলিয়া আদালতের আশ্রয় নিতে হয়েছিল।

১৯১৩ সালে ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্ন হলেন, আইন-ব্যবসায়ে তিনি শীর্ষস্থান অধিকার করলেন, প্রচুর অর্থাগম হতে লাগল—সকলের আগে তিনি পিতাকে ঋণমুক্ত করার কথা চিন্তা করলেন। আইনতঃ তিনি এই ঋণ পরিশোধ না করলেও পারতেন, কিন্তু তাঁর বিবেকের কাছে, তাঁর নীতিবোধের কাছে তিনি কি কৈফিয়ৎ দেবেন? পিতা-মাতার আশীর্বাদে কমলার কৃপা লাভ করেছেন, কাজেই ঋণশোধের কথাটা চিত্তরঞ্জন বিশেষভাবেই চিন্তা করলেন। বন্ধু-বান্ধবরা পরামর্শ দিলেন, এ টাকা তুমি তো না দিলেও পারো। ইন্‌সলভেন্সি নিলে আইন তো তোমাকে বাধ্য করতে পারে না।

—পারে না ঠিকই। তবে আইনের উপরেও কিছু আছে।

—কী?

—বিবেক। সেই বিবেক আমাকে বলছে।

—এ তোমার সেন্টিমেন্ট। অতগুলো টাকা কেন দিতে যাবে।

—এ আমার কর্তব্য।

তারপর হাইকোর্টের বিচারপতি মিস্টার ফ্লেচারের কাছে চিত্তরঞ্জন যখন দেউলিয়া অপবাদ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আবেদন করলেন এবং দেনার সমস্ত টাকা সুদে-আসলে একসঙ্গে দিতে চাইলেন, তখন বিচারপতি ফ্লেচার বলেছিলেন—কেউ দেউলিয়া হবার পরে নিজের ইচ্ছায় সেই ঋণ স্বীকার করে তা সুদে-আসলে পরিশোধ করেছেন, এমন দৃষ্টান্ত আমি কোথাও দেখিনি।

এই ঘটনা জানাজানি হলে সবাই যার-পর-নাই বিস্মিত হলো। যে বিপুল ঋণ তিনি পরিশোধ না করলেও পারতেন, সে ঋণ স্বোপার্জিত অর্থে পরিশোধ করে চিত্তরঞ্জন মনুষ্যত্বের যে জয়পতাকা সেদিন উড়িয়েছিলেন, তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। সত্যের কাছে, ধর্মের কাছে, সর্বোপরি বিবেকের কাছে কেমন করে নিজের মনুষ্যত্ব

প্রমাণ করতে হয়, সেই দৃষ্টান্ত সেদিন রেখেছিলেন চিত্তরঞ্জন তাঁর স্বদেশবাসীর সামনে। সেই যে তিনি বাল্যে কবিতায় পড়েছিলেন ঃ

আমাদের দেশে হবে
সেই ছেলে কবে,
কথায় না বড় হয়ে
কাজে বড় হবে।

তা আজ তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করলেন।

চিত্তরঞ্জন কবি ছিলেন।

সত্যিকার কবি।

আবার তিনি লেখকও ছিলেন।

গল্প ও প্রবন্ধে তাঁর বেশ দক্ষতা ছিল। এর নিদর্শন তিনি রেখে গেছেন পাঁচখানি কাব্যগ্রন্থে, কয়েকটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ ও ছোটগল্পের মধ্যে। সাহিত্যসেবায় তাঁর ছিল অকৃত্রিম অনুরাগ। আইন-ব্যবসায়ে যেমন, এক্ষেত্রেও তেমনি তাঁর প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। তাই দেশবন্ধুর পূর্ণ জীবনের পরিচয় পেতে হলে তাঁর কবিতা, তাঁর প্রবন্ধ পাঠ করতে হয়। কবিতায় তিনি তাঁর নিজের জীবনের অনেক কথাই বলেছেন।

কিশোর বয়স থেকেই তিনি একজন বড় কবি হবার স্বপ্ন দেখতেন। স্বপ্ন নয়—একটা গভীর আকাঙ্ক্ষা অথবা উচ্চ অভিলাষও বলা যায়। জীবনরসিক ছিলেন তিনি—তাই তাঁর পক্ষে অমন ভাবে সাহিত্য-সাধনায় আত্মনিয়োগ করা সম্ভব হয়েছিল। তিনি প্রথম শ্রেণীর কবি না হতে পারেন, কিন্তু সত্যিকার কবি-প্রতিভা ছিল তাঁর মধ্যে। তিনি খাঁটি কবি ছিলেন—বাংলার বাঙালী কবি।

চিত্তরঞ্জন মূলতঃ গীতি-কবি।

তাঁর কবিতার ফসল পর্যাপ্ত নয়, মাত্র স্বল্প আয়তনের পাঁচখানি কাব্যগ্রন্থে বিধৃত হয়েছে তাঁর সমগ্র কবি-চেতনা ও কাব্যানুভূতি। স্বল্প হলেও উজ্জ্বল। ছাত্রজীবন থেকেই তাঁর সাহিত্য-সাধনার সূত্রপাত। প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়বার সময় থেকেই তিনি কবিতা লিখতে শুরু করেন।

তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মালঞ্চ'। ভাষার কোমলতায় ও ভাবের গভীরতায় 'মালঞ্চ' মনোহর। মালঞ্চের অনেক কবিতা ছাত্রাবস্থায় লেখা, আর কিছু বিলাত যাওয়ার সময়। কম বয়সের লেখা হলেও, চিন্তার পরিণতি লক্ষ্য করা যায় এর কোন কোন কবিতার মধ্যে। যেমন 'সোহং' কবিতাটি :

অসার সকল জ্ঞান ; ওহে ব্রহ্মজ্ঞানী !
তবে তুমি কার কর এত অহঙ্কার ?
ক্ষুদ্র তুমি, ক্ষীণ প্রাণে কেমনে ধরিবে
অসীম অনন্ত শক্তি মহা-দেবতার।

'মালঞ্চ'-এর মূল সুর মানুষকে ভালবাসা। 'মালা' তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। এটি একত্রিশটি খণ্ড কবিতার সমষ্টি। 'মালঞ্চ' প্রকাশিত হবার ছয় বছর পরে 'মালা' প্রকাশিত হয়। এই কাব্যে সুন্দরভাবে ঝঙ্কৃত হয়েছে পার্থিব ও ঐশ্বরিক প্রেমের সুর। এখানে কবির প্রেমানুভূতি গীতিকাব্যের সকল সৌন্দর্য ও মাধুর্য নিয়ে ফুটে উঠেছে। এ কাব্যের রস তাই আরো ঘন, আরো সংযত। 'প্রেম ও প্রদীপ' এই কাব্যের একটি কবিতা। কবিতাটির আরম্ভ এইভাবে :

আজি এ সন্ধ্যার মাঝে তব বাতায়নে
কেন রাখিয়াছ ওগো ! প্রদীপ জ্বালিয়া ?
তোমার ও-প্রদীপের কনক-কিরণে
আমার সকল মন উঠে উজলিয়া।

এর পরেই প্রকাশিত হয় কবির 'সাগর-সঙ্গীত'।

চিত্তরঞ্জনের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ এটি।

তাঁর কবি-প্রতিভার এক সার্থক সৃষ্টি।

বাংলার কাব্য-জগতে 'সাগর-সঙ্গীত' এক আশ্চর্য কাব্য-সৃষ্টি। দ্বিতীয় বার যখন তিনি সপরিবারে বিলাত যান, এই কবিতাগুলি সেই সময়ের রচনা। তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের ইঙ্গিত ও ব্যাকুলতা ফুটে উঠেছে এই কাব্যে। গভীর ও উচ্চগ্রামে বাঁধা এর সুর। এমন প্রাণস্পর্শী সুর বাংলা কাব্যে এর আগে শোনা যায়নি। প্রত্যেকটি কবিতার মধ্যে আমরা অনুভব করি বিশ্ব-প্রকৃতির অসীমতা।

আজিকে পাতিয়া কান
শুনেছি তোমার গান,
হে অর্ণব! আলোঘেরা প্রভাতের মাঝে
একি কথা! একি সুর
প্রাণ মোর ভরপুর
বুঝিতে পারিনা তবু কি জানি কি বাজে
তব গীত-মুখরিত প্রভাতের মাঝে!

কাব্যটি শুরু হয়েছে এইভাবে:

হে আমার আশাতীত হে কৌতুকময়ি!
দাঁড়াও ক্ষণেক তোমা ছন্দে গেঁথে লই।

আর শেষ হয়েছে আত্মসমর্পণের সুরে:

হে আমার আজন্ম সখা! কাণ্ডারী আমার
আজ মোরে লয়ে যাও অপারে তোমার।

এখানে একটি কথা উল্লেখ করব। চিত্তরঞ্জনের 'সাগর-সঙ্গীত' যখন প্রকাশিত হয়, তাঁর বন্ধু অরবিন্দ তখন পণ্ডিচেরীতে তাঁর ধ্যানের

আসন পেতে দিব্যজীবনের সন্ধানে নিমগ্ন। কবি তাঁকে একখানি বই উপহারস্বরূপ পাঠিয়ে দিলেন ও তাঁর অভিমত জানতে চাইলেন। ইংরেজী সাহিত্যে অরবিন্দের অগাধ পাণ্ডিত্যের কথা তাঁর জানা ছিল এবং অরবিন্দ যে নিজেও একজন প্রথম শ্রেণীর কবি, তা চিত্তরঞ্জন জানতেন। বন্ধুর 'সাগর-সঙ্গীত' পাঠ করে অরবিন্দ এতদূর মুগ্ধ হলেন যে, তিনি এর একটা ইংরেজী অনুবাদ করে কবিকে পাঠিয়ে দিলেন। সেই অনুবাদ Songs of the Sea নামে প্রকাশিত হয়।

'অন্তর্যামী' ও 'কিশোর-কিশোরী' যথাক্রমে কবির চতুর্থ ও পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ। বাহির জগৎ থেকে কবি এখন ভেতর জগতে প্রবেশ করেছেন। এ দুটি কাব্যগ্রন্থে আমরা তাই পাই কবি চিত্তরঞ্জনের ভাবজীবনের ইতিহাস। সে ইতিহাস ঈশ্বরানুরাগে আর প্রেমের অনুভবে অভিসিঞ্চিত। কবি এখানে চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি-রামপ্রসাদের ভাবের ভাবুক। এই দুটি কাব্যে কবি যে ভাষায় কথা বলেছেন, তা যেন প্রাণের উৎস থেকে উৎসারিত মনের স্বচ্ছন্দ প্রকাশ। কবির কাব্য-বীণায় তাইতো আমরা শুনি মানব-মনের সেই চিরন্তন আকূতি ঃ

কেমনে লাগিয়া গেছ, মন-তটে
কেমনে ছড়ায়ে গেছ, আঁখি-পটে।

এইবার সাহিত্যিক চিত্তরঞ্জনের কথা একটু বলব।
এখানেও তাঁর অবদান বড়ো কম নয়।
পরিমাণে সামান্য, কিন্তু মূল্যের বিচারে অসামান্য।

প্রথমেই বলি তাঁর 'দেশের কথা' সম্পর্কে। বাংলা সাহিত্যে এটি আজো অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। ঢাকা সাহিত্য সম্মিলনীর সভাপতির যে ভাষণটি চিত্তরঞ্জন দিয়েছিলেন, সেইটাই পরে 'দেশের কথা' নামে প্রকাশিত হয়। চিত্তরঞ্জন যে মনেপ্রাণে কতখানি বাঙালী ছিলেন,

বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবের তিনি যে কত বড়ো উত্তরসাধক তা আমরা তাঁর দেশের কথায় জানতে পারি।

"কত দিনের এ দেশ! কত সভ্যতার কাহিনী এই ধূলিতে তাহার চরণচিহ্ন রাখিয়া গেছে; কত দান-সাগর এই সন্ধ্যা-সাগরের তীরে তীরে ঢেউয়ের মাথায় মাণিক ছড়িয়ে গেছে, কে আজি তাহার স্মৃতির ধ্যান করে।··· মাতৃরূপা এই শ্যামলা জননীকে আমরা বারবার নমস্কার করি।"

চিত্তরঞ্জনের সাহিত্যপ্রীতি ছিল অসাধারণ।

সাহিত্যিকদের সঙ্গ তিনি ভালবাসতেন। অর্থসাহায্য করতেন দুঃস্থ কবি ও সাহিত্যিকদের। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্র যে ভাবে তাঁর স্বদেশবাসীকে উদ্‌বুদ্ধ করেছিলেন, সেই আদর্শের অনুসরণে চিত্তরঞ্জন বের করলেন 'নারায়ণ' মাসিক পত্রিকা। তিনিই ছিলেন এর সম্পাদক। বাংলার তখনকার বহু বরেণ্য লেখক এগিয়ে এসেছিলেন 'নারায়ণ'-এর অর্চনায়। বাংলার ঐতিহ্যে যাঁরা বিশ্বাস করতেন আর বাঙালীর বৈশিষ্ট্যের প্রতি যাঁদের ছিল অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা, সেই সব লেখকদের সহযোগিতায় 'নারায়ণ' অল্পদিনেই একটি প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্রিকার গৌরব লাভ করে। 'নারায়ণ' বলতে গেলে চিত্তরঞ্জনের পরিণত সাহিত্য-প্রতিভার ফল। বাংলার চিরন্তন প্রাণ-ধারার সন্ধান নেবার ও দেবার উদ্দেশ্যে এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বিপিনচন্দ্র পাল, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, দীনেশচন্দ্র সেন, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ও ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি মনীষী লেখকবৃন্দ 'নারায়ণ' পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রথম রচনা 'নারায়ণ'—ভাওয়ালের স্বভাব-কবি গোবিন্দদাসের লেখা একটি উৎকৃষ্ট কবিতা।

নানা দিক দিয়ে চিত্তরঞ্জন-সম্পাদিত 'নারায়ণ' পত্রিকা সেদিন সমসাময়িক পত্রিকার ইতিহাসে একটা আলোড়ন এনে দিয়েছিল। একবার এই পত্রিকা সাহিত্য-সম্রাট ও 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের অমর কবি বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে সাহিত্যরসিকদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছিল। এই মাসিক পত্রিকাটির আয়ু স্বল্প হলেও বাণীর পাদপীঠে একটা স্থায়ী স্বাক্ষর রেখে গিয়েছে। চিত্তরঞ্জনের অনেক গান, কবিতা, প্রবন্ধ ও একটি ছোটগল্প এতে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবন্ধগুলির মধ্যে 'ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা', 'শিক্ষা-দীক্ষার কথা' এবং বাংলার 'গীতি-কবিতা' বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত প্রবন্ধে তিনি বৈষ্ণব সাহিত্যের উপর যে সুচিন্তিত ও প্রতিভাপূর্ণ আলোচনা করেন, তেমন আলোচনা তার আগে বা পরে খুব কম লেখকই করতে পেরেছেন। সংখ্যায় কম হলেও চিত্তরঞ্জনের প্রত্যেকটি প্রবন্ধেই মৌলিক চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়।

ভবিষ্যতে যিনিই দেশবন্ধুর গৌরবান্বিত জীবনের আলোচনা করবেন, তিনি নিশ্চয়ই এই কথা লিখবেন যে, সাহিত্যক্ষেত্রে চিত্তরঞ্জন একাধারে গীতিকার, কবি, সমালোচক, প্রবন্ধলেখক প্রভৃতি নানারূপে বাণীর মন্দিরে অর্ঘ্য প্রদান করেছেন, হৃদয়ের সমস্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা নিয়ে। বহু সাহিত্যসভায় তিনি উপস্থিত থাকতেন, কোথাও বা ভাষণ প্রদান করতেন। বাংলা বই ও প্রাচীন পুঁথির একটা বিরাট সংগ্রহ চিত্তরঞ্জনের ছিল। সেগুলি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে দান করে তিনি সাহিত্যপ্রীতির শেষ নিদর্শন রেখে গেছেন।

৫

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি স্মরণীয় বছর।

তেমনি স্মরণীয় চিত্তরঞ্জনের জীবনেও।

এই বছরের এপ্রিল মাসে ভবানীপুরে প্রাদেশিক সম্মেলন হয়। তাতে সভাপতিত্ব করলেন চিত্তরঞ্জন। প্রকৃতপক্ষে এইটাই তাঁর জীবনে রাজনৈতিক অভিষেক। আগামীদিনের এক নতুন নেতার অভ্যুদয় সূচিত হয়েছিল সেদিন ভবানীপুরের সেই প্রাদেশিক সম্মিলনীতে।

কার্জনী বিধানের ফলে স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল বন্যা বয়ে গিয়েছিল বাংলার বুকের উপর দিয়ে, তখন থেকেই। ১৯০৫ সাল থেকে চিত্তরঞ্জন প্রত্যক্ষভাবে না হলেও, পরোক্ষভাবে দেশের কাজে যোগদান করেন। তাঁর ভূমিকা ছিল স্বতন্ত্র। বিপিনচন্দ্র, শ্যামসুন্দর প্রমুখ যে সব দেশবরেণ্য নেতা দেশের কাজে, স্বাধীনতা-সংগ্রামে ঝাঁপ দিয়েছিলেন, তাঁরা যাতে নিশ্চিন্তমনে দেশের কাজ করতে পারেন, সেজন্য চিত্তরঞ্জন মুক্তহস্তে তাঁদের অর্থসাহায্য করতেন।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকেই বাংলা দেশের রাজনৈতিক দল দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে যায়। তাদের একটিকে বলা হতো নরমপন্থী আর অপরটিকে বলা হতো চরমপন্থী। শেষোক্ত দল জাতীয়তাবাদী নামেও পরিচিত ছিলেন। প্রথম দলের নেতা ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ, আর দ্বিতীয় দলে ছিলেন বিপিনচন্দ্র, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্যামসুন্দর, অরবিন্দ প্রভৃতি। বিপিনচন্দ্র ছিলেন চিত্তরঞ্জনের

রাজনৈতিক গুরু ; এঁর কাছেই তিনি রাজনীতির প্রথম পাঠ গ্রহণ করেছিলেন।

১৯০৫ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন বসল।

সভাপতি নির্বাচন নিয়ে দুই দলের মধ্যে দেখা দিল ঘোরতর মতদ্বৈধ। এর ফলে চরমপন্থী দলের কাউকে অভ্যর্থনা সমিতিতে আসন দেওয়া হলো না। তাঁরা একরকম বিতাড়িত হলেন বলা চলে। এঁদের মধ্যে চিত্তরঞ্জনও ছিলেন। বাংলা দেশের কংগ্রেসে নরমপন্থীদের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য। মেদিনীপুর প্রাদেশিক সম্মিলনীতে দুই দলের এই বিরোধ আরো দানা বাঁধল এবং চরমে পরিণত হলো সুরাট কংগ্রেসে—দুই দল একেবারে পৃথক হয়। সেই থেকে দশ বছর কাল কংগ্রেসের সঙ্গে চিত্তরঞ্জনের কোন সম্পর্ক ছিল না। এই সময়টা তিনি সাহিত্য-চর্চা ও আইন-ব্যবসায়ে বিশেষভাবে আত্ম-নিয়োগ করেন।

স্বদেশী আন্দোলনের ফলে বঙ্গভঙ্গ রহিত হয় এবং ১৯০৯ সালে বিক্ষুব্ধ ভারতবাসীকে খুশী করবার জন্য ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের পক্ষ থেকে একদফা নতুন শাসন-সংস্কার প্রবর্তিত হয়। এর নাম মর্লি-মিণ্টো রিফর্ম। তখন মর্লি ছিলেন ভারত-সচিব, আর মিণ্টো ভারতের বড়লাট। ভারতবাসী কিন্তু এই নতুন শাসন-সংস্কারে খুশী হলো না। নরমপন্থী ও চরমপন্থী দুই দলই ইহা প্রত্যাখ্যান করেন। স্বয়ং সুরেন্দ্রনাথ এই শাসন-সংস্কার 'ভূয়া' বলে অভিমত প্রকাশ করলেন।

দেশব্যাপী বিক্ষোভ ও অশান্তির মধ্যেই মর্লি-মিণ্টো শাসন-সংস্কার প্রবর্তিত হয়। তারপর ১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাসে দিল্লীর দরবারে বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ সম্রাট পঞ্চম জর্জের ঘোষণামতো বঙ্গভঙ্গ বাতিল করলেন; কিন্তু কলকাতায় আর ভারতবর্ষের রাজধানী রইল না।

এর পর থেকেই দিল্লী হয় ভারতের রাজধানী। এর ঠিক তিন বছর পরেই য়ুরোপে বাধল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। সেই যুদ্ধ চলেছিল চার বছর। অর্থ ও জনবল দিয়ে ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সরকারকে এই যুদ্ধে সাহায্য করেছিল—এই যুদ্ধের জন্য ভারতীয় সৈন্য সংগ্রহ করেছিলেন মহাত্মা গান্ধী। ভারতবাসীর দাবি ও আশা ছিল, এর বিনিময়ে যুদ্ধের পর শাসকজাতি ভারতবর্ষে প্রকৃত স্বায়ত্ত শাসন চালু করবে। কিন্তু তাদের এই দাবি পূর্ণ হয়নি, এই আশা সম্পূর্ণ চরিতার্থ হয়নি। এই দাবি উঠেছিল কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে। সকলেই আশা করেছিল যে, যুদ্ধের শেষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দেশগুলির শাসন-ব্যবস্থায় আসবে একটা বিরাট পরিবর্তন।

লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড তখন বড়লাট।

মণ্টেগু সাহেব তখন ভারত-সচিব।

এঁদেরই মিলিত প্রয়াসের ফল যুদ্ধোত্তর ভারতে যে নতুন শাসন-সংস্কার প্রবর্তিত হয়, তারই নাম মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড রিফর্ম। নরম-পন্থীরা এই শাসন-সংস্কার মেনে নিলেও, চরমপন্থীরা তা মানলেন না। শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে এটাকে অকিঞ্চিৎকর ও নৈরাশ্যজনক বলে প্রত্যাখ্যান করা হয়।

এই রিফর্ম অনুসারে নতুন ভারত-শাসন আইন প্রবর্তিত হয় ১৯১৯ সালে। এই সব কারণেই ১৯১৯ সালটি ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে স্মরণীয়।

আর এই পরিবেশেই অনুষ্ঠিত হয় ভবানীপুর সম্মেলন। দীর্ঘ দশ বছর পরে রাজনৈতিক মঞ্চে দেখা গেল চিত্তরঞ্জনকে। দেখা গেল সেই স্মরণীয় সম্মেলনের সভাপতিরূপে।

সেই সভায় তিনি বাংলা ভাষায় যে ভাষণ দিয়েছিলেন, সেটিও কম স্মরণীয় নয়। ভাষণটির নাম তিনি দিয়েছিলেন 'বাংলার কথা'।

এর আগে এদেশের কোন রাজনৈতিক সভায় কোন সভাপতি বাংলায় ভাষণ দেননি। তাঁর এই বিখ্যাত ভাষণটি আরম্ভ হয়েছে :

"আজ বাঙালীর মহাসভায় আমি বাংলার কথা বলিতে আসিয়াছি। দেশের নায়ক হইবার অধিকারের যে অহঙ্কার তাহা আমার নাই। কিন্তু আমার বাংলাকে আমি আশৈশব সমস্ত প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছি। যৌবনে সকল চেষ্টার মধ্যে আমার সকল দৈন্য, সকল অযোগ্যতা, অক্ষমতা সত্ত্বেও আমার বাংলার যে মূর্তি প্রাণে প্রাণে জাগাইয়া রাখিয়াছি এবং আজ এই পরিণত বয়সে আমার মানস-মন্দিরে সেই মোহিনীমূর্তি আরো জাগ্রত ও জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।"

'বাংলার কথা'-য় বাঙালীকে তিনি শোনালেন :

"বাংলার যে জীবন্ত প্রাণ, তাহার সাক্ষাৎ পাইয়াছি। বাংলার প্রাণে প্রাণে প্রবহমান যে সভ্যতা ও সাধনার স্রোত, তাহাতে অবগাহন করিয়াছি।...বুঝিলাম বাঙালীর একটা বিশিষ্ট রূপ আছে, একটা বিশিষ্ট প্রকৃতি আছে, একটা স্বতন্ত্র ধর্ম আছে। এই জগতের মাঝে বাঙালীর একটা স্থান আছে, অধিকার আছে, সাধনা আছে, কর্তব্য আছে। বুঝিলাম, বাঙালীকে প্রকৃত বাঙালী হইতে হইবে।"

তখনকার দিনে ইংরেজীতে বক্তৃতা দেওয়ার রীতি ছিল। সেই চিরাচরিত রীতি ভাঙলেন চিত্তরঞ্জন—ভাষণ দিলেন পরিষ্কার বাংলা ভাষায়। অবশ্য, এর একটা ইংরেজী অনুবাদও প্রচারিত হয়েছিল। সেই অনুবাদ খুব আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করেছিলেন এক ইংরেজ রাজপুরুষ—লর্ড রোনাল্ডশে। ইনি তখন বাংলার লাট ছিলেন। তাঁর লেখা 'দি হার্ট অব আর্যাবর্ত' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে তিনি চিত্তরঞ্জনের এই ভাষণটি আলোচনা করেছেন একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে। এই স্মরণীয় ভাষণে চিত্তরঞ্জন সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে তাঁর রাজনৈতিক অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন।

নানা দিক দিয়ে তাঁর এই ভাষণটি অবিস্মরণীয়।

এতদিনকার 'প্রভিন্সিয়াল কন্‌ফারেন্স' আজ রূপান্তরিত হলো 'প্রাদেশিক সম্মিলনী'তে। আর এতদিনকার রাজনৈতিক উত্তেজনা রূপান্তরিত হলো সরল, সহজ ও মর্মস্পর্শী 'বাংলার কথা'য়। নববর্ষের (১৩২৪) সেই বৈশাখে বাঙালী যেন স্বদেশীর দীক্ষা গ্রহণ করল তাঁর কাছে। শুধু দীক্ষা গ্রহণ নয়। পেলো তারা নতুন জীবনের সন্ধান। এই ভাষণে আমরা পাঠ করি ইংরেজীয়ানার অনুসরণকারী বাঙালীদের প্রতি উচ্চারিত চিত্তরঞ্জনের ধিক্‌কার বাণী :

"নকল সাজা সহজ কিন্তু যথার্থ নকল হওয়া বড়ই কঠিন। সাজা জিনিসটা খেয়ালের ব্যাপার, একদিন থাকে, তারপর থাকে না। কিন্তু হওয়া জিনিসটার সঙ্গে রক্ত-মাংসের সম্বন্ধ আছে। কোন একটা জাতিকে কিছু হইতে হইলে তাহার স্বভাব-ধর্মের মধ্যে সেই হওয়া জিনিসটার ভাব থাকা চাই।"

বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দ পরানুকরণের বিরুদ্ধে যে কথা বারবার বলেছিলেন, চিত্তরঞ্জনের এই সুচিন্তিত ভাষণের মধ্যে আমরা যেন তারই প্রতিধ্বনি শুনতে পেলাম। এর থেকেই আমরা বুঝতে পারি মনে-প্রাণে তিনি খাঁটি বাঙালী ছিলেন আর বাংলার রূপের ধ্যানেই তিনি তন্ময় হয়ে থাকতেন। এইজন্যেই তো তাঁর স্বদেশবাসী তাঁকে বসিয়েছিল তাদের হৃদয়ের সিংহাসনে। বাঙালী চিত্তরঞ্জন বাংলার কথা বাংলা ভাষায় বলে আরো একটা কাজ করেছিলেন। তিনি যেন একদিনেই এতকালের প্রবহমান রাজনৈতিক চিন্তাধারার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন।

স্বদেশপ্রেমকে একটা নতুন ব্যঞ্জনা দিলেন তিনি।

রচনা করলেন এর নতুন ভাষ্য।

মামুলি বক্তৃতা নয়—প্রাণস্পর্শী আহ্বান।

তিনি যখন বললেন : "আমাদের যে রাজনৈতিক আন্দোলন, ইহা একটা প্রাণহীন, অলীক ব্যাপার। ইহাকে সত্য করিয়া গড়িতে হইলে বাংলাকে সবদিক দিয়াই দেখিতে হইবে। বাংলার যে প্রাণ, তাহারই উপর ইহার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।"

তখন সেই সভায় উপস্থিত সকলেই অনুভব করেন, জনকল্যাণের পথে স্বদেশপ্রেমকে পরিচালিত করতে না পারলে আমাদের রাজনৈতিক কর্মপ্রয়াস সার্থক হবে না।

'বাংলার কথা' যে শুনল সেই মুগ্ধ হলো।

মুগ্ধ হলো শুধু এর আবেগ বা উচ্ছ্বাসের জন্য নয়—মুগ্ধ হলো এর গঠনমূলক চিন্তার সমাবেশ দেখে। অদূর ভবিষ্যতে দেশকে যিনি স্বরাজ-সংগ্রামে পরিচালিত করবেন, সেই চিত্তরঞ্জন শুধু যে ভাবুক ছিলেন তা নয়। তিনি ছিলেন কর্মী; তাইতো তিনি তাঁর এই ভাষণের শেষাংশে একটা কর্মসূচীও রেখেছিলেন দেশবাসীর সামনে। তাঁর বক্তৃতার এই অংশটা তাই বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

দেশের সুপ্ত ব্যবসা-বাণিজ্যের পুনরুদ্ধার করতে হবে।

কৃষিকার্যের উন্নতিসাধন করতে হবে।

শুধু শহরে বসে রাজনৈতিক গলাবাজিতে কাজ হবে না।

এই বিষয় বিশদ্‌ভাবে বুঝিয়ে দিয়ে চোদ্দ দফা কর্মসূচী রাখলেন জাতির সামনে। নিখুঁত সেই কর্মসূচী।

গ্রামোন্নয়নের কথা গান্ধীর অনেক আগে চিন্তা করেছিলেন চিত্তরঞ্জন। মোট কথা, তাঁর সমগ্র ভাষণটির আসল বক্তব্য ছিল পল্লীগ্রামের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। ভারতের জাতীয় জীবনের কেন্দ্র যে পল্লীগ্রাম—সেই পল্লীগ্রামের সকল রকম উন্নতিবিধান না করতে পারলে কিছুই হবে না—চিত্তরঞ্জনের এই ইঙ্গিতটা সেদিন দেশ

ঠিকমতো নিতে পারেনি। যদি পারতো, তাহলে দেশের চেহারা অনেক আগেই বদলে যেত।

ভাষণের উপসংহারে তাঁর প্রাণের নিবেদন স্বদেশবাসীকে জানালেন চিত্তরঞ্জন ঃ

"বাংলার কথা যেন অচিরে বাঙালীর কার্যে পরিণত হয়। সমবেত চেষ্টা চাই, সমবেত উদ্দেশ্য চাই, বাঙালীর স্বার্থত্যাগ চাই। এই যে জীবন-যজ্ঞ—ইহা শুদ্ধচিত্তে পবিত্র প্রাণে আরম্ভ করিতে হইবে। কর্মক্ষেত্রে অনেক বাধা, অনেক বিঘ্ন। অসহিষ্ণু হইলে চলিবে না। যে অধিকার আজি আমরা দাবী করিতেছি তাহা যুক্তিসঙ্গত, ন্যায়সঙ্গত, আমাদের স্বভাবধর্মসঙ্গত। এই অধিকার হইতে কেহ আমাদিগকে বঞ্চিত করিতে পারিবে না।"

ভবানীপুর সম্মেলন সূচনা করলো একটি মহাজীবনের দিক্-পরিবর্তন। 'বাংলার কথা'-য় আমরা শুনলাম রাজনীতিক্ষেত্রে এক মহান্ নেতার প্রবেশের প্রথম বিরাট শঙ্খধ্বনি। এর অল্পকাল পরেই চিত্তরঞ্জনকে আমরা দেখতে পাব ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের পুরোভাগে। দেখতে পাব তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বের বিদ্যুৎচমক। ভবানীপুরের প্রাদেশিক সম্মিলনীর মঞ্চ থেকেই শুরু হলো তাঁর জীবনের সবচেয়ে ভাস্বর অধ্যায়—ভাস্বর এবং গৌরবান্বিত।

৬

বাংলা ও মহারাষ্ট্র।

ভারত সরকারের শিরঃপীড়ার কারণ ঘটিয়েছিল এই দুটি প্রদেশ। বিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকেই বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লব করে এসেছে বাংলা ও মহারাষ্ট্র। শিবাজীর দেশ মহারাষ্ট্র আর প্রতাপাদিত্যের জন্মভূমি এই বাংলা। শিবাজী বা প্রতাপাদিত্য কেউই শক্তিশালী মুঘলের বশ্যতা স্বীকার করেননি। দুজনেই উড়িয়েছিলেন বিদ্রোহের পতাকা। সংগ্রাম করেছিলেন প্রবল রাজশক্তির বিরুদ্ধে। ভারতবর্ষে ইংরেজ আমলে বিপ্লবের রণডঙ্কা প্রথম শোনা গিয়েছিল মহারাষ্ট্রে। বালগঙ্গাধর তিলক তখন নবীন মহারাষ্ট্রের নেতা। তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিল এক মারাঠা তরুণ—বিনায়ক দামোদর সাভারকর। একালের ভারতবর্ষে তিনিই ছিলেন শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী। বাংলা দেশে বিপ্লবের গুরু ছিলেন অরবিন্দ। বরোদায় থাকবার সময়ে পুণার ঠাকুরসাহেবের কাছে তিনি গ্রহণ করেন বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্র। বাংলার তরুণদের সেই মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিলেন তিনি।

ইংরেজ রাজশক্তি বহু চেষ্টা করেও এতকাল এই বিপ্লব দমন করতে সক্ষম হয়নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যখন তারা নতুন শাসন-সংস্কারের কথা চিন্তা করছিল, ঠিক সেই একই সঙ্গে তারা চিন্তা করেছিল বিপ্লব দমনের উপায়। বাংলা ও মহারাষ্ট্রে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন সম্পর্কে একটা ব্যাপক তদন্তের কথা অনেকদিন ধরেই

ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট চিন্তা করছিলেন। যুদ্ধের সময়ে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য ভারত-রক্ষা আইন চালু হয়। তার ফলে বিনা বিচারে বাংলা ও মহারাষ্ট্রের বহু জাতীয়তাবাদী নেতাকে আটক রাখা হয়, কাউকে বা অন্তরীণাবদ্ধ করে রাখা হয়। বলা হয়েছিল, যুদ্ধ চলা পর্যন্ত এই আইনের মেয়াদ থাকবে। যুদ্ধ যখন শেষ হয় তখন ১৯১৭ সাল—গঠিত হয় রৌলট কমিটি।

এই কমিটি তদন্ত করে একটা রিপোর্ট প্রকাশ করে। সেই রিপোর্ট আর নতুন শাসন-সংস্কার সম্পর্কিত মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড রিপোর্ট ১৯১৮ সালে প্রায় একই সময়ে প্রকাশিত হয়। রৌলট রিপোর্টে সুপারিশ করা হলো যে, জুরি ছাড়াই রাজনৈতিক মামলার বিচার করা চলবে এবং সন্দেহক্রমে যে-কোন ব্যক্তিকে বিনা বিচারে ও অনির্দিষ্ট কালের জন্য অন্তরীণাবদ্ধ করার পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হবে প্রাদেশিক সরকারকে। সেই সুপারিশ অনুযায়ী চালু হয় রৌলট আইন। এই আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠল সারা ভারতবর্ষে। আইন পাস হলো ১৯১৯ সালের ২১শে মার্চ।

•

ভারতের আকাশে দেখা দিল ঝড়ের মেঘ।

সেই মেঘের মধ্যে সঞ্চিত ছিল বিদ্যুৎ ও বজ্র।

মহাত্মা গান্ধী এই আইনের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ ঘোষণা করলেন। একদিকে সারা দেশ তখন প্রস্তাবিত নতুন শাসন-সংস্কারের সমালোচনায় মুখর, অন্যদিকে রৌলট আইনের বিরুদ্ধে দেখা দিল তীব্র অসন্তোষ। গান্ধী ঘোষণা করলেন—'রৌলট আইন ভারতবাসীর ন্যায়সঙ্গত অধিকার ও মানুষের জন্মগত স্বাভাবিক স্বাধীনতার পরিপন্থী।' তিনি এর প্রতিবাদ করলেন। কিন্তু কে শুনবে সেই প্রতিবাদ?

প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে আইন পাস হয়ে গেল।

একটি মারাত্মক আইনের নাগপাশে রুদ্ধ হয় ভারতবাসীর কণ্ঠ।

ভারতের আকাশে দেখা দিল কালবৈশাখীর ঝড়।

বিক্ষুব্ধ, অশান্ত ভারতবাসী এসে দাঁড়ায় একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মুখে।

একি ধাপ্পাবাজী শাসকের! এক হাত দিয়ে যা দেওয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, অন্য হাত দিয়ে তা কেড়ে নেওয়ার জন্য তৈরি হলো রৌলট আইন। তখন গান্ধী এই আইনের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করবার জন্য আহ্বান জানালেন। পাশবশক্তির বিরুদ্ধে নৈতিক বল নিয়ে দাঁড়ালেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী—নবীন ভারতের ভাবী নেতা। গান্ধী-রচিত সত্যাগ্রহের প্রতিজ্ঞাপত্রটি পাঠ করে চিত্তরঞ্জন তাঁকে অভিনন্দিত করলেন শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী বলে। গান্ধীর মতো তিনিও রৌলট আইনের বিরুদ্ধে ছিলেন। গান্ধীর সত্যাগ্রহ বাণীর মধ্যে তিনি দেখতে পেলেন আশার আশা।

১৯১৯।

৬ই এপ্রিল রবিবার।

সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু হলো।

সারা ভারতবর্ষ গান্ধীর আহ্বানে সাড়া দিল। উপবাস, প্রার্থনা, হরতাল ও শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ—এই ছিল আন্দোলনের স্বরূপ। সর্বত্র প্রতিপালিত হয় হরতাল। কিন্তু দিল্লী ও পাঞ্জাবে পুলিশের গুলী চালনার ফলে অবস্থা অন্যরূপ ধারণ করে। পুলিশের দমননীতি প্রবল রূপ নিয়ে দেখা দিল দিল্লী ও পাঞ্জাবে। পাঞ্জাবের অমৃতসরে দুজন জনপ্রিয় নেতাকে গ্রেপ্তার করে কোথায় যে রাখা হলো কেউ জানতে পারল না। এই ঘটনার ফলে অমৃতসরে সামরিক বাহিনীর

যে নিষ্ঠুর নৃশংসতা প্রকাশ পায়, তার তুলনা সভ্যজগতের ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না। সমগ্র পাঞ্জাবে সেদিন নেমে এসেছিল সামরিক আইনের লৌহ যবনিকা। ফলে, বাইরের লোক অনেক দিন পর্যন্ত জানতে পারেনি জালিয়ান্‌ওয়ালাবাগের নৃশংস ঘটনা।

১৩ই এপ্রিল, ১৯১৯।

বৈশাখের নববর্ষের দিন।

অমৃতসরের জালিয়ান্‌ওয়ালাবাগে উৎসবের জন্য সমাগত হয়েছে হাজার হাজার নর-নারী, শিশু ও বৃদ্ধ। বাগটির তিন দিক পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। বেরুবার পথ একটিই। জেনারেল ডায়ারের হুকুমে সেই নিরস্ত্র জনতার ওপর গুলী চালনা করা হয় নির্বিচারে। কিছুকাল পরে পাঞ্জাবের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সংবাদ যখন জানা গেল, তখন সবচেয়ে বেশী মর্মাহত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি জানালেন এই বর্বরতার প্রতিবাদ। তিনি তখন 'স্যর' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। শাসকের দেওয়া সেই সম্মানের মুকুট তিনি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। বড়লাট চেম্‌স্‌ফোর্ডকে এক চিঠি লিখে তিনি উপাধি ফিরিয়ে নিতে অনুরোধ করেন।

সত্যাগ্রহ আন্দোলন অবশ্য আর চলল না।

গান্ধী নিজেই তা বন্ধ করে দিলেন।

পাঞ্জাবের ঘটনাবলী তদন্ত করার জন্য ভারত সরকারের পক্ষ থেকে গঠিত হয় হাণ্টার কমিশন। কংগ্রেস সেই কমিশন বর্জন করলো এবং কংগ্রেস থেকে গান্ধীকে সভাপতি করে একটা পৃথক বে-সরকারী তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। মতিলাল নেহরু, চিত্তরঞ্জন, জয়াকর ও তায়েবজী—এই চারজন ছিলেন এই কমিটির সভ্য। প্রকৃতপক্ষে একা চিত্তরঞ্জনের ঘাড়েই পড়েছিল তদন্তের সম্পূর্ণ দায়িত্ব।

এই উপলক্ষে গান্ধী ও চিত্তরঞ্জন—এই দুজন নেতা প্রথম পরস্পরের সান্নিধ্যে এলেন।

তদন্ত কার্যে প্রাণ ঢেলে দিলেন চিত্তরঞ্জন।

তিন মাস চলেছিল এই তদন্ত কার্য।

এই সময়ে চিত্তরঞ্জন নিজের পকেট থেকে খরচ করেছিলেন পঞ্চাশ হাজার টাকা। তিনি তাঁর সমস্ত প্রতিভা ও শ্রম নিয়োগ করেছিলেন এই কাজে। এই ছিল তাঁর স্বভাব—যখন যে কাজ ধরতেন তাতে সমস্ত মন-প্রাণ ঢেলে দিতেন। কংগ্রেসের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, জালিয়ান্‌ওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড সম্পর্কিত যাবতীয় সাক্ষ্য-প্রমাণের বিশ্লেষণে তিনি অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। এমন কি পাঞ্জাবে সামরিক আইন প্রয়োগ যে অন্যায় হয়েছিল, তাও তিনি অপূর্ব যুক্তির সঙ্গে প্রমাণ করেছিলেন।

এই পটভূমিকায় অমৃতসরে বসলো কংগ্রেসের অধিবেশন।

ডায়ারি নৃশংসতার মর্মন্তুদ স্মৃতি-বিমণ্ডিত ও নিরস্ত্র ভারতবাসীর রক্তে রঞ্জিত অমৃতসরেই কংগ্রেসের ৩৪তম অধিবেশন বসল ১৯১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে। এই স্মরণীয় অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন মতিলাল নেহরু। গুরুত্বপূর্ণ এই অধিবেশনে তিলক, বিপিনচন্দ্র, মালব্য, গান্ধী, চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি অনেক জননেতা উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন না শুধু সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ মডারেট নেতারা। তাঁরা নতুন শাসন-সংস্কার মেনে নিতে সম্মত হয়েছিলেন ও সেই অনুসারে কাজ করবেন বলে সরকারকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এই বছর থেকেই তাই কংগ্রেসের নবযুগ শুরু হয়। এই যুগের নেতা—গান্ধী।

নতুন শাসন-সংস্কার গৃহীত হবে কিনা এইটাই ছিল অমৃতসর কংগ্রেসের সামনে প্রধান প্রশ্ন। ইংরেজের ব্যবস্থায় বিশ্বাসী গান্ধীর

কাছে এই রিফর্ম গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছিল। কিন্তু চিত্তরঞ্জনের প্রবল বিরোধিতার জন্য তিনি আর বেশী অগ্রসর হতে পারেননি। অমৃতসর কংগ্রেসে যে মূল প্রস্তাবটি উত্থাপিত হয়েছিল সেটি রচনা করেছিলেন স্বয়ং চিত্তরঞ্জন। ঐ প্রস্তাবে বলা হয় যে, আত্ম-নিয়ন্ত্রণের নীতি অনুসারে পূর্ণ দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থা ভারতে প্রবর্তন করার জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্ট যেন অবিলম্বে ব্যবস্থা করেন।

মূল প্রস্তাবটির খসড়া দেখে বোঝা গেল, চিত্তরঞ্জন এইবার দুর্দমনীয় তেজে কংগ্রেসে প্রবেশ করলেন। অমৃতসর কংগ্রেসে সবাই তাঁর উপস্থিতিটা যেভাবে অনুভব করল, এমনভাবে আর কারো উপস্থিতি তারা অনুভব করেনি। রৌলট আইন, পাঞ্জাবের নৃশংস ঘটনাবলী আর অসার নতুন শাসন-সংস্কার—এই তিনটি বিষয়ই চিত্ত-রঞ্জনের মনের মধ্যে জাগিয়েছিল একটা তুমুল আলোড়ন। তিনি দূরদৃষ্টিবলে বুঝতে পারলেন ভারতের রাজনৈতিক দৃশ্যপট এবার বদলাবে। ইতিহাসের দিগন্তে যেন তারই ইঙ্গিত।

এবার ঝড় উঠবেই, বুঝলেন চিত্তরঞ্জন।

উড়বে এবার নতুনের কেতন।

আকাশে-বাতাসে ও জনচিত্তে পুঞ্জীভূত হয়েছে যে উন্মাদনা, এবার তার বিস্ফোরণ ঘটবেই। অমৃতসর কংগ্রেসেই তিনি সকলের অগোচরে মনে মনে সংকল্প গ্রহণ করলেন সর্বস্ব ত্যাগ করে এবার দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করবেন।

১৯২০, ১লা আগস্ট।

লোকমান্য তিলকের মৃত্যু হলো।

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের এই প্রবীণ নেতার কণ্ঠে উচ্চারিত শেষ কথা ছিল এই : 'স্বরাজ লাভ না হলে ভারতের উন্নতি নেই।'

এই মহারাষ্ট্র-কেশরীর কণ্ঠে ভারতবাসী সর্বপ্রথম শুনেছিল—'স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার।'

১৯২০, ৪ঠা সেপ্টেম্বর।

কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন।

এই অধিবেশনে গান্ধী ঘোষণা করলেন তাঁর নতুন কর্মসূচী—অসহযোগ। তিনি বললেন—'অসহযোগ আমার কর্তব্য।' ভারতবাসী গ্রহণ করল অসহযোগের মন্ত্র। শুধু অসহযোগ নয়, অহিংস অসহযোগ। অমৃতসর কংগ্রেসে এক ঘরোয়া বৈঠকে গান্ধী যখন তাঁর অসহযোগ নীতির কথা তোলেন, তখন চিত্তরঞ্জন তাঁকে বলেছিলেন—এত তাড়াতাড়ি কেন? এর থেকে বুঝা যায়, তিনি অসহযোগের মূল নীতি সম্বন্ধে গান্ধীর সঙ্গে একমত ছিলেন, কিন্তু উপায় ও সময় সম্পর্কে তাঁর ভিন্ন মত ছিল।

চিত্তরঞ্জনের রসারোডের বাড়ী।

নেতাদের একটা বৈঠক বসল সেখানে এক সন্ধ্যায়।

সে বৈঠকে গান্ধী উপস্থিত ছিলেন। চিত্তরঞ্জন তাঁকে বললেন—পাঁচ বছর পরে আন্দোলন আরম্ভ করুন।

—এখন করলে দোষ কি? জিজ্ঞাসা করেন গান্ধী।

—আমার মনে হয় দেশ প্রস্তুত নয়।

—দেশকে তৈরি করে নিতে হবে। আমার মনে হয় আন্দোলনের এই উপযুক্ত সময়।

—আমার তো তা মনে হয় না। তাছাড়া ব্রিটিশ সরকার এই সময়ের মধ্যে আরো কিছু করলেও করতে পারে—সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসন ভারতবাসীর হাতে তুলে দিতে পারে।

—যদি তা না করে?

—তখন আমি ঝাঁপিয়ে পড়ব।

আলোচনা এর বেশী হয়নি। তবে গান্ধী একটা কথা বুঝলেন যে, বাংলা যদি অসহযোগ গ্রহণ না করে, ভারতে অসহযোগ চলবে না। আরো বুঝলেন, চিত্তরঞ্জনকে যদি তিনি তাঁর স্বমতে না আনতে পারেন, তাহলে বাঙালী অসহযোগ আন্দোলনে সাড়া দেবে না। অসহযোগ ভাল, কিন্তু শুধু নেতিবাচক অসহযোগে কিছু হবে না, সেই সঙ্গে চাই গঠনমূলক কর্মসূচী—এই ছিল চিত্তরঞ্জনের ধারণা। তাঁর ধারণাই যে যথার্থ, তা পরে সকলেই উপলব্ধি করেন।

দেশে নতুন শাসন-সংস্কার প্রবর্তিত হয়েছে।

সেই নিয়ম অনুসারে নির্বাচন শীঘ্র হবে।

কংগ্রেস সেই নির্বাচন বর্জন করতে চায়। চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে কংগ্রেস তথা গান্ধীজীর প্রবল মতবিরোধ দেখা দিল। 'কাউন্সিলকে আমি স্বরাজলাভের যন্ত্ররূপে ব্যবহার করতে চাই'—এই কথা তিনি বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই বললেন। কিন্তু গান্ধীজী তা বুঝতে চাইলেন না। শেষ পর্যন্ত কলকাতা কংগ্রেসে চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি নেতাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও পাস হয়ে যায়। তবে এটা ছিল কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন। ঠিক হলো চার মাস পরে নাগপুরে কংগ্রেসের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

১৯২০। ডিসেম্বর মাস।

নাগপুরে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন বসল।

ইতিমধ্যে নতুন আইন অনুসারে কাউন্সিল নির্বাচন হয়ে গেল। বাংলার জাতীয়তাবাদী দলের পক্ষ থেকে এই নির্বাচনে কোন প্রতি-দ্বন্দ্বিতা করা হলো না। ফল যা হবার তাই হলো। মডারেট দল নির্বাচনে জয়ী হলেন। হস্তান্তরিত বিষয়গুলি দেশীয় মন্ত্রীদের হাতে দেওয়া হলো। বাংলার 'মুকুটহীন রাজা' সুরেন্দ্রনাথ মন্ত্রিত্ব গ্রহণ

করলেন। দেশের লোক তাঁকে ধিক্‌কার দিল। কিন্তু মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে সুরেন্দ্রনাথ যে আদৌ ভুল করেননি, সেটা বুঝতে আমাদের সময় লেগেছিল।

নাগপুর কংগ্রেসে গান্ধীজীর অসহযোগ প্রস্তাবের বিরোধিতা করবেন ঠিক করলেন চিত্তরঞ্জন। সারা ভারতের দৃষ্টি তখন এই অধিবেশনের ফলাফলের উপর নিবদ্ধ। কমপক্ষে পনের হাজার প্রতিনিধি যোগদান করেছিলেন এই স্মরণীয় কংগ্রেসে। প্রায় পাঁচশো প্রতিনিধি নিয়ে বাংলা দেশ থেকে এসেছিলেন চিত্তরঞ্জন, সঙ্গে ছিলেন বিপিনচন্দ্র ও ব্যোমকেশ চক্রবর্তী। যুগান্তর ও অনুশীলন দলের অনেক বিপ্লবীও প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেন। সকলের যাওয়া-আসার খরচ বহন্‌ করলেন চিত্তরঞ্জন।

"নিরস্ত্র ভারতের হাতে তরবারি থাকলে সে তাই নিয়ে আজ যুদ্ধ করত। তা যখন নেই, তখন নিরস্ত্র দেশের পক্ষে অহিংস অসহযোগই হবে তার স্বাধীনতা-যুদ্ধের প্রকৃত অস্ত্র।"—এই কথা গান্ধীজী যখন বললেন, তখন চিত্তরঞ্জনের মনে বিরোধিতা করার ইচ্ছা আর রইল না। তিনি বুঝলেন দেশের সামনে এখন এর চেয়ে ভাল আর কোন কার্যস্থূচী নেই। আরো বুঝলেন, যদি এর ফলে দেশের নিদ্রিত জনগণ জাগ্রত হয়, তবে দেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের পক্ষে তা কল্যাণপ্রদ হবে।

প্রকাশ্য অধিবেশনের আগের দিন রাত্রে গান্ধীজীর সঙ্গে এক ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হলেন চিত্তরঞ্জন। দুজনের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা চললো।

—একটা বছর আমাকে কাজ করতে দিন, মিঃ দাশ।

—আপনি কি মনে করেন এক বছরেই স্বরাজলাভ হবে?

—তাই মনে করি।

—তা যদি না হয় ?

—তখন আমি আপনার মত মেনে নেব। কংগ্রেসকে বলব কাউন্সিলে যেতে।

—বেশ তাই হোক। আমি প্রকাশ্য অধিবেশনে আপনাকে সমর্থন করব এবং আমি নিজেই অসহযোগ প্রস্তাবের মুসাবিদা করব ও সেটা উত্থাপন করব।

দুই নেতার মধ্যে আপোষ হয়ে গেল।

চিত্তরঞ্জন অসহযোগী হলেন।

৭

গান্ধীর সঙ্গে বোঝাপড়া হয়ে গেল।

চিত্তরঞ্জন অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করলেন।

নাগপুর থেকে কলকাতায় ফিরলেন এক নতুন চিত্তরঞ্জন।

অহঙ্কারশূন্য মন, শান্ত সমাহিত চিত্ত।

দেশকে জাগাতে হবে—বাঙালী জাতিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। কী উপায়ে?

অন্তর থেকে ইঙ্গিত পেলেন—সর্বস্ব ত্যাগ করে।

সেই ১৯১৭ সাল থেকে যে কথা তিনি বলে আসছিলেন সর্বস্ব ত্যাগ করো, নইলে এ খেলার দরকার নেই—আজ সেই কথা কাজে প্রমাণ করতে অগ্রসর হলেন তিনি।

সর্বস্ব ত্যাগ মানে কি?—অতুল যশ, অনুপম গৌরব, অপরিমিত সম্পদ আর দীর্ঘদিনের সুখভোগ ও বিলাসব্যসন—এ সবই ছাড়তে হবে বিনা দ্বিধায়। দেশজননীর বেদীমূলে অর্পণ করতে হবে সর্বস্ব —এমন কি প্রিয়পরিজনকেও, আর দরকার হলে প্রাসাদতুল্য বসত-বাড়ীটা পর্যন্ত। সে দাশসাহেব আর রইলেন না তিনি—যাঁর সুখ-বিলাসভোগ একটা কিংবদন্তীতে দাঁড়িয়েছিল। ইন্দ্রের ঐশ্বর্য ত্যাগ করে নামলেন তিনি পথের ধূলায়—জনগণের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন বাঙালীর হৃদয়ের রাজা চিত্তরঞ্জন।

মানুষটাই পাল্‌টে গেলেন যেন রাতারাতি।

আমীর থেকে ফকির।

ভোগী থেকে ত্যাগী।

তার্কিক থেকে প্রেমিক।

ত্যাগের একটা বিরাট দৃষ্টান্ত দেখালেন চিত্তরঞ্জন—যে দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে আজ পর্যন্ত আর কোন নেতা দেখাতে পারেননি। তাঁর সেই বিপুল ত্যাগের মহিমা কবির লেখনীতে ফুটেছে এইভাবে ঃ

ছিল ঘুমঘোরে রাজার দুলাল,
জানিতে না কে সে পথের কাঙাল
ফেরে পথে পথে ক্ষুধাতুর সাথে ক্ষুধার অন্ন মাগি,
তুমি সুধার দেবতা 'ক্ষুধা ক্ষুধা' বলে
কাঁদিয়া উঠিলে জাগি'—
ওগো চির বৈরাগী।
আঙিয়া তোমার নিলে বেদনার গৈরিক রঙে রেঙে'
মোহ ঘুমপুরী উঠিল শিহরি' চমকিয়া ঘুম ভেঙে।
জাগিয়া প্রভাতে হেরে পুরবাসী
রাজা দ্বারে দ্বারে ফেরে উপবাসী ;
সোনার অঙ্গ পথের ধূলায় বেদনার দাগে দাগী।
কে গো নারায়ণ নররূপে এলে নিখিল বেদনাভাগী॥
ওগো চির বৈরাগী।

চিত্তরঞ্জন সর্বস্ব ত্যাগ করে দেশের কাজে নামলেন।

ওকালতি পর্যন্ত ছেড়ে দিলেন। ছাড়লেন তিনি সযত্নলালিত সুখভোগ।

বাংলা দেশে সেদিন আশ্চর্য রকম সাড়া পড়ে গেল। তারপর থেকেই অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ শহর থেকে গ্রামে গ্রামে ভেসে

চলল বাংলা দেশের অন্তঃস্থল আলোড়িত করে। এক বিরাট বিপুল ভাব-তরঙ্গের সৃষ্টি হলো জনগণের মনে—পদ্মা ও গঙ্গার কূলে কূলে। গান্ধীজী স্বয়ং বাংলা দেশ ঘুরে যা করতে পারেননি, একা চিত্তরঞ্জন তাই সফল করে তুললেন। যেদিন মির্জাপুর পার্কের জনসভা থেকে বাঙালী জানতে পারল যে, চিত্তরঞ্জন আইন-ব্যবসা ত্যাগ করেছেন, সেদিন দেশবাসীর মনে সৃষ্টি হলো এক নতুন উন্মাদনার।

সর্বস্ব ত্যাগ করে পথে এসে দাঁড়ালেন চিত্তরঞ্জন।

গ্রহণ করলেন দেশসেবার মহান ব্রত।

বাংলা দেশ মুগ্ধবিস্ময়ে তাঁকে অভিনন্দিত করল 'দেশবন্ধু' বলে। মির্জাপুর পার্কের সেই বিরাট জনসভায় নায়ক-সম্পাদক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় দেশের পক্ষ থেকে 'দেশবন্ধু' বলে তাঁকে প্রথম অভিনন্দন জানালেন। তাঁর বক্তৃতায় পাঁচকড়িবাবু বলেছিলেন ঃ

'আমাদের প্রিয়তম বন্ধু চিত্ত—বাংলা দেশের খ্যাতনামা ব্যারিস্টার, দেশের সুপ্রসিদ্ধ জননায়ক, দেশ-নেতা, সর্বস্ব ত্যাগ করে আজ সন্ন্যাসী হয়ে দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করলেন—এত বড় ত্যাগ, এতখানি দেশপ্রীতি, এমন নিঃস্ব হয়ে দেশ-মাতৃকার পূজায় আহুতি দানের তুলনা বাংলা দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে ত নাই-ই —অন্য দেশের ইতিহাসেও নাই বলেই আমার বিশ্বাস। সর্বত্যাগী চিত্তরঞ্জন আজ দেশের চিত্ত জয় করেছেন—আমরা তাঁকে আজ 'দেশবন্ধু' বলে আমাদের অন্তরের অভিনন্দন জানাচ্ছি।'

সেই থেকে চিত্তরঞ্জন নাম মুছে গেল।

ইতিহাসের পটে জেগে উঠল একটি নতুন নাম—দেশবন্ধু।

সেদিন থেকে মানুষের বন্ধুরূপে ভারতের ভাগ্যাকাশে নবোদিত সূর্যের মতো যাঁকে আমরা পেলাম—সেই বিখ্যাত ব্যারিস্টার, সেই অপরিমিত তেজী ও বিলাসী মানুষটির পরিবর্তে যাঁকে পেলাম,

ভারতের মুক্তিসাধনার ইতিহাসে ঠিক এমনভাবে আর কোন নেতাকে আমরা পাইনি। তাঁরই দৃষ্টান্তে দেশে জাগল নতুন উদ্দীপনা।

উকিল ওকালতি ছাড়লেন।

অধ্যাপক অধ্যাপনা ছাড়লেন।

ছাত্ররা স্কুল-কলেজ ছেড়ে কংগ্রেসের কাজে যোগদান করবার জন্য দলে দলে ছুটে আসতে লাগল। সকলের মনে হলো—এ যৌবন জল-তরঙ্গ রুধিবে কে? চিত্তরঞ্জনের ত্যাগ সাধারণ ত্যাগ ছিল না—তা ছিল বিনীত অন্তরের পরিপূর্ণ নিবেদন—দেশ-দেবতার চরণে আত্মনিবেদন। চিত্তরঞ্জন বললেন—"যাদের জন্য আমাদের কাজ, সকলের আগে তাদেরকেই ভালবাসতে হবে—দেশের মঙ্গলের জন্য কাজে হাত দেওয়া মানে দেশবাসীকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসা।"

এই চিত্তরঞ্জনকে দেশের লোক নেতা বলে গ্রহণ করল।

গ্রহণ করল তাঁকে 'স্বদেশবন্ধু' বলে।

স্টার থিয়েটারে একটা ছাত্রসভা হয় এই সময়ে। ছাত্রদলের বিরাট সভা। বক্তা—মহাত্মা গান্ধী, মৌলানা মহম্মদ আলি ও চিত্তরঞ্জন দাশ। সেই সভায় দেশবন্ধু বললেন—'তোমরা যে গোলাম-খানা ছেড়ে বেরিয়ে এসেছ আমার আহ্বানে, এতে আমার যে কি আনন্দ হয়েছে তোমরা সেটা বুঝতে পারবে না। তোমরাই আমার আশা ভরসা, তোমরা আমার সঙ্গে থাকলে আমার বুকের বল বেড়ে যাবে চতুর্গুণ। আমি ইংরেজের রক্ত চক্ষুকে ভ্রূক্ষেপও করব না। জানি, দেশের অনেক কাজ তোমাদের মুখ চেয়ে আছে।'

ছাত্ররা বলল—আমাদের লেখাপড়ার কি হবে?

—আমি তোমাদের কথা দিচ্ছি, বাংলা দেশের জাতীয় শিক্ষার গোড়াপত্তন হবে তোমাদের দিয়ে। আমি এমন একটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলব যার গৌরবে সারা ভারতবর্ষ গৌরবান্বিত

হবে। তোমরা জান না তোমরা আমার কতখানি প্রিয়, কতখানি নির্ভর করি আমি তোমাদের শক্তি ও উদ্যমের ওপর।

বাংলার ছাত্রসম্প্রদায় সেদিন সত্যিই দেশবন্ধুর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। তাদের জন্য তিনি যে বিদ্যাপীঠ ও গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তন নামে স্কুল-কলেজ করেছিলেন, সেকথা পরে বলব। অতঃপর প্রবল উৎসাহে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন দেশবন্ধু। তাঁর রসারোডের বাড়ীটা যেন রাতারাতি নতুন রূপ ধারণ করল—জাতীয় আন্দোলনের একটা পীঠস্থানে পরিণত হলো। ক্রমে তাঁর চারদিকে রচিত হয় বিপুল কর্মের আবর্ত। দিনরাত শুধু কাজ আর কাজ—যেমন করেই হোক বাংলার বুকে অসহযোগের বন্যাস্রোত বইয়ে দিতে হবে।

সেই স্বদেশী যুগের সময় থেকে বাংলার বিপ্লবীদের সঙ্গে দেশবন্ধুর ছিল প্রাণের যোগ। আগেই বলেছি, তখনকার যত বিখ্যাত রাজনৈতিক মামলা তার প্রত্যেকটায় আসামীপক্ষের কৌঁসুলিরূপে দাঁড়াতেন তিনি। দাঁড়াতেন বিনা পারিশ্রমিকেই। এছাড়া, অর্থ দিয়ে, সামর্থ্য দিয়ে বিপ্লবীদের সাহায্য করতেন তিনি। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে তাঁর বিশ্বাস ছিল না, কিন্তু বিপ্লবীদের দেশপ্রেমকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন। তাই না তাদের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও আনুগত্য তিনি লাভ করেছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করে দেশবন্ধু বুঝলেন, এদের বাদ দিয়ে তিনি সফলকাম হতে পারবেন না। তাই নাগপুর থেকে কলকাতায় ফিরে তিনি পুলিন দাস, বিপিন গাঙ্গুলী, জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ কয়েকজন বিপ্লবী নেতাকে তাঁর বাড়ীতে ডেকে পাঠালেন। বললেন তাদের, তোমরা আমার পাশে না দাঁড়ালে চলবে না।

—কিন্তু আমরা তো অহিংসায় বিশ্বাস করি না।

—বেশ তো। মহাত্মাজী একটা বছর সময় চেয়েছেন। তোমরা এই সময়টা অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করো।

—এ আন্দোলনের লক্ষ্য কি ?

—স্বরাজলাভ। তাছাড়া এটাকে তোমরা ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন বলে মনে করতে পারো। আমাদের সকলের লক্ষ্যই তো এক—স্বাধীনতা। স্বাধীনতার জন্য আমি সর্বস্ব ত্যাগ করেছি, তোমরা পারবে না ?

আর বেশী বলতে হলো না।

বাংলার বিপ্লবীরা দাঁড়ালেন দেশবন্ধুর পাশে।

বন্যার স্রোতের মতোই এলো অসহযোগ আন্দোলন।

দুর্বার বেগে প্রবাহিত হলো সেই আন্দোলন সারা বাংলা দেশে।

এগিয়ে এলেন বিপ্লবীরা।

এগিয়ে এলো ছাত্র-সমাজ।

১৯২১। ১৪ই জানুয়ারি। ছাত্রদের এক বিরাট সভায় দেশবন্ধু বললেন : "এক বছর কি দুবছর তোমরা লেখাপড়া স্থগিত রাখতে পারো, কিন্তু স্বরাজসংগ্রামে তোমাদের এখনি যোগদান করতে হবে। গঠনমূলক কাজ করতে হবে তোমাদের। দেশের তরুণরা যদি এইভাবে এগিয়ে আসে তাহলে পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করে দেশ স্বাধীন হবেই।"

—আমাদের জন্য স্কুল করে দেবেন বলেছিলেন।

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই দেব।

স্কুল-কলেজ-ছেড়ে-আসা ছাত্রদের জন্য তিনি স্কুল করলেন। এগার নম্বর ওয়েলিংটন স্কোয়ারে (এখনকার নাম রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার) 'ফোরবেস ম্যানসন' নামে একটা বিরাট বাড়ী ভাড়া নেওয়া হলো। এইখানেই প্রতিষ্ঠিত হয় গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তন ও জাতীয় মহাবিদ্যালয়। এর উদ্বোধন করেছিলেন মহাত্মা গান্ধী। এই

বাড়ীতেই অসহযোগের বিরাট কর্মযজ্ঞের সূচনা। এখানেই নবীন বাংলার এক নতুন নেতৃত্বের অভ্যুদয়। এখানেই নবীন ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে বিরচিত হয় এক নতুন অধ্যায়। সে অধ্যায়ের স্রষ্টা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। এই পীঠস্থানেই আর একটি বিদ্রোহী তরুণের আবির্ভাব ঘটেছিল। তিনি সুভাষচন্দ্র বসু —দেশবন্ধুর মানসপুত্র ও তাঁরই ভাবধারার উত্তরসাধক।

ফোরবেস ম্যানসনের তিন-তলা বাড়ীতে খোলা হলো গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তন।

এর প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন অধ্যাপক জে. এল. ব্যানার্জি (জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়)। একতলায় ছিল বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অফিস, আর দুতলা ও তিনতলায় ছিল কলিকাতা বিদ্যাপীঠ, গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তন ও আয়ুর্বিজ্ঞান বিদ্যালয়। আয়ু-র্বিজ্ঞান বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠার মূলে ছিলেন তিনজন—ডাঃ সুন্দরী-মোহন দাস, ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায় ও ডাঃ এস. সি. সেন। এই বিদ্যালয়টি বর্তমানে ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে রূপান্তরিত হয়েছে। এইভাবেই সেদিন অসহযোগ আন্দোলনের বিপুল উত্তেজনার কেন্দ্র-স্থল হয়ে দাঁড়িয়েছিল ফোরবেস ম্যানসন। বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে এই বাড়ীটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এইরকম জাতীয় বিদ্যালয় বাংলা দেশের অনেক জেলায় তখন স্থাপিত হয়েছিল।

সময় নেই দেশবন্ধুর।

অসহযোগ আন্দোলনকে সার্থক করতে হবে।

আহার-নিদ্রা সব ত্যাগ করলেন। এইবার নামলেন তিনি অসহযোগের বাণী প্রচার করতে। ১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষভাগ থেকে শুরু হয় এই প্রচারব্রত। পাঁচ মাস ধরে তিনি সমগ্র

পূর্ববঙ্গে অক্লান্তভাবে ভ্রমণ করেছিলেন। ব্যারিস্টার সি. আর. দাশ —ইন্দ্রের তুল্য যাঁর ঐশ্বর্য আর ভোগবিলাস—সেই মানুষ আজ সর্বস্ব ত্যাগ করে নেমেছেন দেশের কাজে। তাঁর এই অতুলনীয় ত্যাগে সারা পূর্ববঙ্গে জাগল নবীন জীবন-চেতনা—পদ্মা, মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্রের কূলে কূলে জাগল শিহরণ। দেশবন্ধুকে দেখবার জন্য কি আগ্রহ, তাঁর বক্তৃতা শুনবার জন্য জনমনে সে কি আকুলতা, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা, মৈমনসিংহ, টাঙ্গাইল, মৌলভীবাজার, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট, কুমিল্লা, বরিশাল—পূর্ববাংলার জেলায় জেলায় ঘুরে অসহযোগের বাণী তিনি প্রচার করলেন।

দিকে দিকে জাগরণ, দিকে দিকে চাঞ্চল্য।

প্রাণ-প্রবাহ বইতে লাগল পূর্ববাংলার জেলায় জেলায়।

ছাত্ররা স্কুল-কলেজ ছাড়ল, আইনজীবীরা আদালত বর্জন করলেন। সবাই তুলে নিলেন কাঁধে অসহযোগের পতাকা। চলল চরকা কাটা, খদ্দর তৈরি করা ও খদ্দর প্রচার। গ্রামে গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয় খাদিকেন্দ্র। কুমিল্লার 'অভয় আশ্রম' এই রকম একটা বিখ্যাত কেন্দ্র ছিল। স্বদেশী আন্দোলনের যুগ যেন বাংলায় আবার ফিরে এলো। সারা দেশ টলমল করতে থাকে। সারা বাংলার আকাশ-বাতাস অসহযোগ মন্ত্রমুখর হয়ে উঠল।

দেশবন্ধুর ত্যাগে আকৃষ্ট ও উদ্‌বুদ্ধ হয়ে কত উচ্চপদস্থ ব্যক্তি এসে দাঁড়ালেন তাঁর পাশে। চট্টগ্রাম থেকে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, মেদিনীপুর থেকে বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, তেওতার জমিদার কিরণশঙ্কর রায়, কৃষ্ণনগর থেকে হেমন্তকুমার সরকার, বাঁকুড়া থেকে অনিলবরণ রায়—এমনি আরো কত। এঁদের মধ্যে কেউ ছিলেন আইনজীবী, কেউ বা অধ্যাপক, কেউ বা জমিদার। এই সব সুযোগ্য কর্মীদের পেয়ে দেশবন্ধুর উৎসাহের সীমা-পরিসীমা ছিল না। বিভিন্ন বিভাগে

প্রাদেশিক কংগ্রেসের কাজ ভাগ করে এক-একজনের উপর তিনি এক-একটা দায়িত্ব ন্যস্ত করলেন।

ঠিক এমনি সময়ে আর একজন তরুণ এসে দাঁড়ালেন দেশবন্ধুর পাশে। তিনি সুভাষচন্দ্র বসু। ১৯২০ সালে ইনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় চতুর্থ হয়ে পাস করেন। ১৯২১ সালে কেম্‌ব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে 'দর্শন'-এ সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। বিলাত থেকেই তিনি দেশবন্ধুকে এক পত্র লিখে তাঁর দেশের কাজ করার সংকল্পের কথা জানিয়েছিলেন। দেশবন্ধু তাঁকে বুকে তুলে নিলেন। সিভিলিয়ানিতে ইস্তফা দিয়ে সুভাষচন্দ্র দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। এটাও বড়ো কম ত্যাগের কথা ছিল না তাঁর পক্ষে। সুভাষচন্দ্র বিদ্যাপীঠের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ। পরে বাংলা কংগ্রেসের প্রচার-বিভাগের দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেছিলেন। দেশবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনে সুভাষচন্দ্রের মতো সর্বত্যাগী কর্মীকে লাভ, তাঁর জীবনের একটা বিশেষ ঘটনা। বিদ্যায় ও বাগ্মিতায়, ত্যাগে ও সংগঠনে এবং ব্যক্তিত্বে ও চরিত্রে সুভাষচন্দ্র ছিলেন দেশবন্ধুর যোগ্য উত্তরসাধক।

৮

দেখতে দেখতে আট মাস অতিক্রান্ত হলো।

অসহযোগ আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠলো।

আন্দোলন চলার সময় এক একদিন দুশোর উপর স্বেচ্ছাসেবক কলকাতাতেই গ্রেপ্তার হয়েছে, দণ্ডিত হয়েছে, আত্মপক্ষ সমর্থন করবার কল্পনাও করেনি। নানা স্থানে পুলিশের গুলীতে লোক প্রাণ হারিয়েছে—সাহস হারায়নি। মোটকথা, স্কুল-কলেজ ও আদালত বর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাই ছিল অগ্রণী। তেমনি এক বিরাট কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করে দেশবন্ধু তাঁর সংগঠনী শক্তির পরিচয় দিলেন। কিন্তু স্বরাজের সূচনা দেখা গেল না। অনেক কর্মীর মনে প্রশ্ন জাগল—কৈ, কি হলো ? ঠিক সেই সময়ে এক সরকারী ঘোষণা-পত্রে জানা গেল ইংলণ্ডের যুবরাজ ভারত-পরিদর্শনে আসছেন। কংগ্রেস থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো যুবরাজকে বয়কট করতে হবে।

নভেম্বর মাসে যুবরাজ ভারতে এলেন।

তিনি যেদিন বোম্বাইয়ে উপনীত হন, সেদিন সেখানে হাঙ্গামা হয়। গান্ধী এজন্য অনশন করলেন। কলকাতায় কোন হাঙ্গামা হয়নি। শান্তিপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে কলকাতায় যুবরাজের আগমন ও সম্বর্ধনা বয়কট করা হয়। এর সমস্ত কৃতিত্ব ছিল সুভাষচন্দ্রের। হরতাল বন্ধ করবার জন্য লাটসাহেব দেশবন্ধুকে অনুরোধ করেন। তিনি সম্মত হলেন না। দেশবন্ধু বুঝলেন এবার তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবেই। তাই তিনি যুবরাজকে বয়কট করার সমস্ত দায়িত্ব দিলেন

সুভাষচন্দ্রের উপর। ১০ই ডিসেম্বর তাঁকে গ্রেপ্তার করা হলো। তিনি তখন প্রদেশ কংগ্রেসের ডিরেক্টর। জেলে যাওয়ার আগে দেশবন্ধু শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীকে প্রদেশ কংগ্রেসের দ্বিতীয় ডিরেক্টর পদে নিযুক্ত করে যান।

তাঁর গ্রেপ্তারের কিছু আগে সরকার স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী বেআইনী ঘোষণা করলেন ও সমস্ত সভা-সমিতি নিষিদ্ধ করে দিলেন। এই স্বৈরাচারের সমুচিত জবাব দিয়েছিলেন দেশবন্ধু। প্রদেশ কংগ্রেস থেকে প্রচারিত হলো—সরকারের এই আদেশ অবৈধ। চললো আগের মতো শহরের মহল্লায় মহল্লায় খদ্দর ফেরি ও পিকেটিং এবং বিলিতী কাপড়ের বহ্ন্যুৎসব। ফোরবেস ম্যানসন থেকে রোজই তিনশো-চারশো-পাঁচশো করে স্বেচ্ছাসেবক এই কাজের জন্য প্রেরিত হয়। পুলিশও তাদের ধরে ধরে জেলে পুরতে থাকে। শুরু হয় দেশের সর্বত্র অভূতপূর্ব গ্রেপ্তারের পালা আর সেই সঙ্গে পুলিশের লাঠিবাজি।

চিররঞ্জন—দেশবন্ধুর একমাত্র পুত্র—গ্রেপ্তার হলেন।

গ্রেপ্তার হলেন স্ত্রী বাসন্তীদেবী ও ভগ্নী উর্মিলাদেবী এবং অন্যান্য পুরমহিলাবৃন্দ। দেশের কাজে মেয়েদের বন্দী হওয়া বাংলায়, সম্ভবত ভারতবর্ষেও এই প্রথম।

যুবরাজ যেদিন কলকাতায় এলেন, সেদিন সারা বাংলার কর্ম ও ভাব-কেন্দ্র এই সদাচঞ্চল কলকাতা মহানগরীতে নিস্তব্ধ অসহযোগের মধ্য দিয়ে যে বিক্ষুব্ধ অথচ দৃঢ় প্রতিবাদ সার্বজনীনভাবে ব্যাপ্ত হয়েছিল, তার তুলনা পাওয়া কঠিন। সরকারকে আশঙ্কায় স্তব্ধ হয়ে যেতে হয়েছিল। যুবরাজের ভারত-পরিদর্শন উপলক্ষ্যে এমন সার্থক বয়কট আর কোথাও হয়নি। এর পর থেকেই দমননীতির প্রকোপ বাড়তে থাকে।

জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন সুভাষচন্দ্র। হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবকে কলকাতা ও বাংলা দেশের বিভিন্ন স্থানের জেল ভরে গেল। স্থান সঙ্কুলান হয় না—রক্তবীজের মতো স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর যেন শেষ নেই। তৈরি হয় স্পেশাল জেল। আইন অমান্যকারীদের বন্দী করে রাখার জন্য। আজ এই সুদূর কালের ব্যবধানে আমরা কল্পনা করতে পারব না যে, সেদিনকার সেই যৌবন জলতরঙ্গের গতিবেগে প্রবল পরাক্রান্ত রাজশক্তি কি রকম চঞ্চল, বিব্রত ও বিপর্যস্ত হয়ে উঠেছিল। এর মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন দেশবন্ধুর অসামান্য নেতৃত্ব ও ব্যক্তিত্বের জয় বিঘোষিত হয়েছিল, অন্যদিকে তেমনি সুভাষচন্দ্রের অতুলনীয় সংগঠনী প্রতিভার পরিচয় পেয়ে দেশবাসী বিস্মিত হলো।

যুবরাজ যখন কলকাতায় আসেন, তখন দেশবন্ধুর মামলা চলছিল। বিচারাধীন কয়েদী হিসাবে জেলে বসেই তিনি জানতে পারলেন যে, যুবরাজের আসার দিন সমস্ত শহর নিস্তব্ধ, নীরব, পথঘাট জনমানব-শূন্য শ্মশান—লোক নেই, জন নেই, গাড়ি নেই, ঘোড়া নেই। বোঝা গেল, বিশেষ করে শাসকশক্তি বুঝলেন যে, সেদিন সত্যিই একদিনের জন্য একটিমাত্র মানুষের ইঙ্গিতে মহানগরীর প্রাণস্পন্দন থেমে গিয়েছিল। সেই মানুষটি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। তাঁর নেতৃত্বের প্রতাপ সরকার এবার অনুভব করলেন। তাই না তাঁকে গ্রেপ্তার করা হলো। ধৃত হওয়ার সময় দেশবন্ধু তাঁর দেশবাসীর উদ্দেশে একটি বাণীতে বলেছিলেন: 'সমগ্র ভারতবর্ষই এখন একটি কারাগারে পরিণত হয়েছে।'

বিচারে দেশবন্ধুর ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড হলো।

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল তখন সরগরম।

দেশবন্ধু, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী থেকে আরম্ভ করে তরুণ সুভাষচন্দ্র,

হেমন্তকুমার প্রমুখ বহু বিশিষ্ট রাজবন্দীর আগমনে এই জেলখানাটি তখন সত্যিই এক নতুন রূপ ধারণ করেছিল বললেই হয়। এর আগে এখানে এমন দৃশ্য কখনো দেখা যায়নি। জেলে এসেও দেশবন্ধুর বিশ্রাম ছিল না।

১৯২১ সাল শেষ হলো। সংঘাত ও বিক্ষোভপূর্ণ স্মরণীয় একটি বছর শেষ হলো। এই বছরের কংগ্রেস অধিবেশন বসল আমেদাবাদে। এই কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলেন দেশবন্ধু। কিন্তু তখন তিনি জেলে। তাই সভাপতিত্ব করার উপায় ছিল না তাঁর। সভাপতির ভাষণটি তিনি জেলে বসেই লিখে পাঠিয়ে দিলেন। কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে সেটি পাঠ করেন সরোজিনী নাইডু।

আমেদাবাদ কংগ্রেসে প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল একটি।

আইন অমান্য আন্দোলন।

এটা ছিল মহাত্মার প্রস্তাব।

অসহযোগ আন্দোলনের পর এই ছিল তাঁর দ্বিতীয় কর্মসূচী।

ঠিক হলো যে, গুজরাটের বারদৌলি তালুকে নতুন পর্যায়ের এই আন্দোলন শুরু হবে। ফেব্রুয়ারি (১৯২২) মাসে বারদৌলির এক জনসভায় গান্ধী জনসাধারণকে সত্য ও অহিংসার শপথ গ্রহণ করতে বললেন। বললেন—দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সবাইকে যে-কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকতে হবে। এর পরেই বড়লাট লর্ড রীডিংকে এক চিঠিতে গান্ধী তাঁর সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে ছিলেন।

জেলে বসেই দেশবন্ধু এই সংবাদ পেলেন।

তিনি ও তাঁর সহবন্দীরা আশা করলেন যে, এবার আন্দোলন আরো ব্যাপক ও শক্তিশালী হবে, কারণ স্বয়ং গান্ধী এবার আন্দোলন পরিচালনা করবেন। সকলের মনেই এই প্রত্যাশা জাগল যে, ভারতবর্ষ এবার স্বাধীনতার পথে আরো কিছুটা অগ্রসর হবেই।

বড়লাটকে গান্ধী যে চিঠিখানি লিখেছিলেন তাকে একটি চরমপত্র বলা যেতে পারে। সেই চিঠিতে তিনি সরকারকে এক সপ্তাহকাল সময় দিয়েছিলেন। যদি এর মধ্যে সরকারের হৃদয়ের পরিবর্তন হয়, তাহলে তিনি আন্দোলন করবেন না বলেছিলেন।

সপ্তাহকাল তখনো অতিক্রান্ত হয়নি।

আচম্বিতে ঘটনাস্রোত অন্যদিকে মোড় নিল।

চৌরিচৌরার ক্রুদ্ধ জনতা এক কাণ্ড করে বসল।

উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলা; তারই অন্তর্গত একটি ছোট্ট শহর চৌরিচৌরা। কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে স্থানীয় কৃষকরা হঠাৎ পুলিশ থানা আক্রমণ করে ও কয়েকজন পুলিশকে হত্যা করে। বারদৌলিতে গান্ধী যখন ভবিষ্যৎ আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন, তখন এই মর্মান্তিক সংবাদে তিনি বিচলিত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে ডাকা হলো ওয়ার্কিং কমিটির একটি জরুরী বৈঠক। প্রস্তাব নিয়ে এলেন গান্ধী—এরই নাম 'বারদৌলি প্রস্তাব'। সেই প্রস্তাবে গান্ধী দেশের সবরকম আন্দোলন—অহিংস অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন—বন্ধ করে দেওয়ার জন্য সুপারিশ করলেন। প্রস্তাব পাস হয়ে গেল। সমস্ত আন্দোলন একেবারে বন্ধ হয়ে গেল।

আলিপুর জেলে এই সংবাদ যখন পৌঁছল দেশবন্ধুর কাছে, তখন তিনি যার-পর-নাই বিস্মিত হলেন। শুধু বিস্মিত হওয়া নয়, গান্ধীর এই আচরণে তিনি ক্ষুব্ধ হলেন। কংগ্রেসের অন্যান্য যে সব নেতা তখন কারাগারে ছিলেন, তাঁদের অনেকেই এই সংবাদে দেশবন্ধুর মতোই বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হলেন। হবারই কথা। কারণ, এর ফলে দেশব্যাপী আন্দোলন যখন প্রায় সাফল্যের কাছাকাছি এসেছে, তখন হঠাৎ এই আন্দোলন বন্ধ করে দেওয়া গান্ধীর পক্ষে যে ঠিক হয়নি,

সেটা গান্ধী নিজেই অনেক পরে বুঝতে পেরেছিলেন। তখন জেলের মধ্যে বসেই দেশবন্ধু চিন্তা করতে থাকেন—এর পর কি করা যায়।

আন্দোলন বন্ধ করে দিলেন গান্ধী।

অমনি ভারত সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করলেন।

বিচারে তাঁর ছয় বছর কারাদণ্ড হলো।

১৯২২, ৯ই আগস্ট।

দেশবন্ধু কারামুক্ত হলেন।

তখন তাঁর শরীর খুবই অসুস্থ।

চিকিৎসকরা তাঁকে পরামর্শ দিলেন, এবার একটু বিশ্রাম নিতে।

দেশবন্ধু হেসে শুধু বললেন—দেশের কাজে নেমেছি, বিশ্রামের অবসর কোথায়? এটা যে আমার ব্রত। এই ব্রত উদ্‌যাপন না হওয়া পর্যন্ত বিশ্রামের কথা চিন্তাই করতে পারি না আমি।

একেই বলে নেতা, সবাই ভাবল।

ভারতবর্ষের মুক্তি-সংগ্রামে সেদিন বুঝি এমনি একজন নেতারই দরকার হয়েছিল।

কারামুক্তির পর কলকাতার হরিশ পার্কের এক জনসভায় দেশবন্ধুকে সংবর্ধনা জানান হলো। সেই সভায় সভাপতিত্ব করেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। দেশবন্ধুকে যে মানপত্রটি দেওয়া হয়, সেটি রচনা করেন শরৎচন্দ্র তাঁর অননুকরণীয় ভাষায়। সেই অভিনন্দন পত্রে দেশবন্ধুর বহুবিধ গুণের উল্লেখ ছিল, আর ছিল দেশের জন্য তাঁর ত্যাগস্বীকারের কথা। সেই অভিনন্দন পত্রের উত্তর দিতে গিয়ে দেশবন্ধুর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল। বেশী কথা বলতে পারলেন না। নির্বাক নিস্পন্দভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন—শুধু দুই চোখ বেয়ে অশ্রুধারা ঝরতে লাগল।

এই দৃশ্য স্বচক্ষে দেখেছিলেন সুভাষচন্দ্র। তিনি লিখেছেন—"তরুণের রাজা কাঁদিলেন, তরুণেরাও কাঁদিল।"

ছোট মেয়ের বিয়ে বাকী ছিল।

এইবার সেই কাজটা সারলেন।

তারপর আবার দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন দেশবন্ধু তাঁর সর্বশক্তি নিয়ে।

বুঝলেন দেশের বর্তমান অবস্থায় আইন অমান্য আন্দোলন চলবে না। চলবে না অহিংস অসহযোগ। পথ একটাই আছে—বিধান-সভায় যাওয়া। যে নতুন শাসন-সংস্কার দেশে প্রবর্তিত হয়েছে, তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতে গেলে বিধানসভায় যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। বাইরে যে সংগ্রাম চলছিল এতদিন, এখন তাকেই তিনি বিধানসভার কক্ষমধ্যে নিয়ে যেতে চাইলেন। কংগ্রেস কিন্তু এর বিপক্ষে ছিল—বিপক্ষে ছিলেন গান্ধীও। তাই দেশবন্ধু তাঁর সহকর্মী ও অনুগামীদের বললেন, "আইনসভায় গিয়ে আমরা এইটাই প্রমাণ করব যে, এই শাসন-সংস্কার দ্বারা দেশের কোন কল্যাণ সাধিত হয়নি, হতে পারে না। কারণ এখনো পর্যন্ত দেশ-শাসনের প্রকৃত ক্ষমতা দেশবাসীর হাতে দেওয়া হয়নি।"

আরো বললেন, "আমি স্বাধীনতা চাই। আমি স্বরাজ চাই। এই স্বরাজের অর্থ পরিপূর্ণ স্বাধীনতা—চল্লিশ কোটি ভারতবাসীর নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করবার নিরঙ্কুশ অধিকার লাভ। এর জন্যই আমি বিধানসভায় গিয়ে সংগ্রাম করব।"

এর পরেই গয়া কংগ্রেসের সভাপতিরূপে দেশবন্ধু তাঁর ভাষণে তাঁর নতুন কর্মসূচী, অর্থাৎ আগামী নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে আইন-সভায় প্রবেশ করার কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন।

১৯২২ সালের ডিসেম্বর মাস। সেবার কংগ্রেসের অধিবেশন

বসল গয়াতে। সভাপতি নির্বাচিত হলেন দেশবন্ধু। জেল থেকে বেরিয়ে এসে অবধি এতদিন তিনি যে কথা বলে আসছিলেন, এখন গয়া কংগ্রেসের সভাপতিরূপে তাঁর ভাষণে সেই কথাটাই তিনি ঘোষণা করলেন—আইনসভায় গিয়ে সংগ্রাম চালাবার মত ব্যক্ত করলেন। কিন্তু তাঁর এই প্রস্তাব গৃহীত হলো না।

গান্ধী-অনুগামী নেতারা তাঁর বিরোধিতা করলেন।

ভোটে তাঁর প্রস্তাব বাতিল হয়ে গেল।

চিত্তরঞ্জন পরাজিত হয়ে ক্ষুব্ধ হলেন কিন্তু নিরুৎসাহ হলেন না। গঠন করলেন তিনি স্বরাজ্যদল। অতঃপর এই নতুন দলের দলপতিরূপে তিনি আইনসভায় গিয়ে যে চমকপ্রদ ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন, তা কোনদিনই ভুলবার নয়। গান্ধী তখন জেলে। জেলে বসেই তিনি স্বরাজ্যদলের কথা শুনলেন।

কংগ্রেসের বাইরে গিয়ে নয়, কংগ্রেসের মধ্যে থেকেই নতুন দল গঠন করলেন দেশবন্ধু। স্বরাজ্যদলের সভাপতি ছিলেন তিনিই, আর এর সম্পাদক ছিলেন মতিলাল নেহরু। কংগ্রেস দুই দলে ভাগ হয়ে গেল। একদল ছিলেন পরিবর্তনের বিরুদ্ধে, এঁদের বলা হলো 'নো-চেঞ্জার' (No-changer), আর অন্যদল ছিলেন পরিবর্তনের স্বপক্ষে, এঁদের বলা হলো 'প্রো-চেঞ্জার' (Pro-changer)। শেষোক্ত দলের নেতা ছিলেন দেশবন্ধু।

গয়া থেকে ফিরে স্বরাজ্যদল গঠনে মন দিলেন তিনি। সামনেই নির্বাচন। সেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে জয়লাভ করতে হলে, স্বরাজ্যদলকে উপযুক্তভাবে গঠন করতে হবে। একা দেশবন্ধু যেন একশো দেশবন্ধু হয়ে নামলেন দলগঠনের কাজে। ঝড়ের বেগে ঘুরে বেড়ালেন সারা ভারতবর্ষ। বীরবিক্রমে নানা শহরে নানা সভায় তিনি প্রচার করতে লাগলেন স্বরাজ্যদলের মতাদর্শ। তখন

তাঁর বয়স পঞ্চাশ পার হয়েছে, স্বাস্থ্যও ভাল নয়। তবু সেই বয়সে সেই ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে দেশবন্ধু যৌবনের তেজ ও শক্তি নিয়ে দলগঠনের কাজে যে পরিশ্রম করেছিলেন, তা ভাবলে পরে বিস্মিত হতে হয়। পরাধীনতার জ্বালা যাঁর অন্তরে আগুন জ্বালিয়েছিল, সেই চিত্তরঞ্জন দেশের কাজে এমনি করে আহুতি দিয়েছিলেন তাঁর জীবন।

শুধু কি পরিশ্রম ?

সেই সঙ্গে অর্থের দুশ্চিন্তাও ছিল।

দেশের বড়ো বড়ো কাগজগুলো তখন তাঁর বিরুদ্ধে—তাঁর স্বরাজ্যদলের বিরুদ্ধে। স্বরাজ্যভাণ্ডার নিঃস্ব। অর্থসংগ্রহ, নিজস্ব একখানা খবরের কাগজ বের করা—এই সব কত কাজের কথা তখন যে দেশবন্ধুকে ভাবতে হয়েছিল তা বলে শেষ করা যায় না। অবশ্য, তাঁর এই কাজে সুভাষচন্দ্র প্রমুখ কয়েকজন সুযোগ্য কর্মীকে তিনি তাঁর পাশে পেয়েছিলেন বলেই না, সকল প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়ে তিনি চালিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন স্বরাজ-রথ।

১৯২৩। ২৩শে অক্টোবর।

ভারতবর্ষের সংবাদপত্র জগতের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। ঐদিন প্রকাশিত হয় স্বরাজ্যদলের মুখপত্র, নতুন ইংরেজী দৈনিক 'ফরোয়ার্ড' (Forward)। প্রধান সম্পাদক : চিত্তরঞ্জন দাশ। 'ফরোয়ার্ড' কাগজের সকল দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করলেন সুভাষচন্দ্র। তিনিই তখন দেশবন্ধুর দক্ষিণহস্তস্বরূপ বললেই হয়। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদকের পদেও তখন নির্বাচিত হয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র। অমন খ্যাতনামা সাংবাদিক এসে যোগদান করলেন দেশবন্ধুর 'ফরোয়ার্ড' কাগজে। প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সারা ভারতবর্ষে এই নতুন সংবাদপত্র যে আলোড়ন নিয়ে এসেছিল তার তুলনা নেই। স্বদেশীযুগে অরবিন্দের ইংরেজী কাগজ

'বন্দেমাতরম্' যে রকম অভিনন্দন লাভ করেছিল, আজ দেশবন্ধু-সম্পাদিত 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকাও ঠিক সেইভাবে অভিনন্দিত হলো।

আইনসভার নির্বাচন আসন্ন হয়ে এলো।

স্বরাজ্যদলের পক্ষ থেকে দেশবন্ধু সেই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করলেন। দলের পক্ষ থেকে বিভিন্ন জেলা থেকে স্বরাজ্যদলের প্রার্থীকে দাঁড় করানো হলো। এই নির্বাচনে বাকারপুর কেন্দ্র থেকে দাঁড়ালেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—যিনি একদা জাতির 'মুকুটহীন' রাজা বলে সম্মানিত হয়েছিলেন তাঁর স্বদেশবাসীর কাছে। তাঁরই বিপক্ষে দেশবন্ধু দাঁড় করালেন এক তরুণ চিকিৎসককে। তাঁর নাম ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়—যিনি স্বাধীন ভারতবর্ষে পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রীরূপে তাঁর যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তখন কেইবা চিনতো এই বিধানচন্দ্রকে ? কিন্তু অসম্ভবকে সম্ভব করলেন দেশবন্ধু। নির্বাচনে সুরেন্দ্রনাথকে হারিয়েছিলেন। এইভাবে বাংলা দেশের নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় জয়লাভ করে স্বরাজ্যদল যে সাড়া জাগাল, নির্বাচনের ইতিহাসে তা অবিস্মরণীয় হয়ে আছে।

লর্ড লিটন তখন বাংলার লাট।

নির্বাচনের ফল আইনসভায় স্বরাজ্যদলই বেশী সংখ্যক আসন লাভ করেছে। তাই লাটসাহেবের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ এলো দেশবন্ধুর কাছে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করার জন্য। স্বরাজ্যদলের পক্ষ থেকে সে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যাত হলো। তারপর বিরোধী দলের নেতা হিসাবে আইনসভায় প্রবেশ করে সরকারের দ্বৈতশাসন তিনি কিভাবে অচল করে দিয়েছিলেন, কিভাবে তিনি নতুন শাসন-সংস্কারের অসারতা প্রমাণ করে দিয়েছিলেন দিনের পর দিন—সে-সব ইতিহাস তোমরা বড়ো হয়ে জানবে।

আইনসভার নির্বাচনে জয়লাভ করার পর কলকাতার পৌরসভার নির্বাচন এলো নতুন মিউনিসিপাল আইন অনুসারে। দেশবন্ধুর নেতৃত্বে স্বরাজ্যদল পৌরসভার নির্বাচনেও অংশ গ্রহণ করল এবং পৌরসভা দখল করল। নতুন পৌরসভার প্রথম মেয়র হওয়ার গৌরব লাভ করলেন দেশবন্ধু। সুভাষচন্দ্রও পৌরসভার নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেছিলেন। তাঁকেই দেশবন্ধু পৌরসভার প্রধান কর্মসচিব নিযুক্ত করলেন। কিন্তু বেশী দিন এই পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারেননি। ১৯২৪ সালের ২৫শে অক্টোবর বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সের বলে সুভাষচন্দ্র ধৃত হন ও বিনাবিচারে তাঁকে জেলে আটক রাখা হয়।

সিমলায় বসে দেশবন্ধু যখন জানতে পারলেন সুভাষচন্দ্রকে ও তাঁর অনুগামী আরো বহু কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তখন দেশবন্ধু আর স্থির থাকতে পারলেন না। তাঁর মনে হলো, স্বরাজ্যদলের ক্রমবর্ধমান শক্তিকেই যেন সরকার আঘাত হানতে চাইছেন। তিনি বিশ্রামসুখ ত্যাগ করে ফিরে এলেন কলকাতায়। ফিরে এসেই এই গ্রেপ্তার ও বিনাবিচারে আটক রাখার বিরুদ্ধে পৌরসভার পক্ষ থেকে তিনি যে দৃঢ় ভাষণ দিয়েছিলন, তার ছত্রে ছত্রে যেন আগুন ঠিকরে পড়েছিল। "যদি দেশকে ভালবাসা অপরাধ হয়, তাহলে আমিও একজন অপরাধী।"—এই বিখ্যাত কথাটি তিনি সেদিন বলেছিলেন।

গুরুতর পরিশ্রম তাঁর জীর্ণদেহ যেন আর সহ্য করতে পারল না।

১৯২৫ সনের শুরুতেই দেশবন্ধুর স্বাস্থ্যের এমন অবনতি হলো যে, সকলেই উদ্বেগ প্রকাশ করলেন। আসল কথা, সুভাষচন্দ্র প্রমুখ তাঁর বিশ্বস্ত কর্মীদের অর্ডিন্যান্স আইনে গ্রেপ্তার হওয়ার পর থেকেই যে মানসিক অশান্তি তিনি ভোগ করেন, তার ফলেই তাঁর স্বাস্থ্য

একেবারে জীর্ণ হয়ে যায়। এই অসুস্থ শরীর নিয়েই তিনি আইন-সভায় শেষ বক্তৃতা করেছিলেন ১৯২৫ সালের মার্চ মাসে। এই অসুস্থ শরীর নিয়েই দেশবন্ধু মে মাসের গোড়ায় ফরিদপুর প্রাদেশিক সম্মিলনীতে সভাপতিত্ব করেন। এই সভার উদ্বোধন করেছিলেন মহাত্মা গান্ধী। গান্ধী বলেছেন ঃ "ফরিদপুর দেশবন্ধুর অতুলনীয় বিজয়ের ক্ষেত্র। ফরিদপুর অভিভাষণে তাঁর মহতী রাজনীতিজ্ঞতা এবং যুক্তিপরায়ণতা সপ্রমাণিত হয়েছে।"

তাঁর পরিণত বয়সের রাজনৈতিক চিন্তা ও দূরদর্শিতার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর আছে দেশবন্ধুর ফরিদপুর ভাষণে। তাঁর জীবনে এটাই ছিল সর্বশেষ বক্তৃতা। এই বক্তৃতায় তিনি যেমন সম্মানজনক সহযোগিতার কথা বলেছিলেন তেমনি আলোচনা করেছিলেন, হিংসা-অহিংসার কথা এবং স্বরাজ ও স্বাধীনতার প্রসঙ্গ। বলেছিলেন—"আমাদের জাতির সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতার যে আদর্শ, তাহাই স্বরাজ। স্বরাজের আদর্শ স্বাধীনতার আদর্শের চেয়ে অনেক বড়ো।"

ফরিদপুর থেকে জ্বর নিয়ে কলকাতায় ফিরলেন দেশবন্ধু ৫ই মে। রসারোডের বাড়ীতে উঠলেন না—উঠলেন তাঁর এক বন্ধুর বাড়ীতে। কারণ সে বাড়ী তখন তাঁর ছিল না ; দানপত্র করে তা তিনি দেশ-বাসীর হাতে অর্পণ করেছেন। সকলে এসে তাঁর কুশল জিজ্ঞাসা করেন। একদিন তাঁর অন্যতম সহকর্মী ব্যারিস্টার নিশীথচন্দ্র সেনকে তিনি বললেন—"নিশীথ, তোমরা গঙ্গার ধারে আমার জন্যে একটা কুঁড়েঘর তৈরি করে দিও, জীবনের শেষ কয়টা দিন আমি সেখানেই থাকব।"

হায়, রাজরাজেশ্বর, একদিন ছিল তোমার কুবেরের ঐশ্বর্য।
তোমারই শিরে বর্ষিত হয়েছে অজস্রধারে লক্ষ্মীর কৃপা।
তারপর দেশজননীর চরণে সর্বস্ব অর্পণ করে তুমি সাজলে ভিখারী।

প্রাসাদ ত্যাগ করে আজ তাই তুমি পর্ণকুটীরে বাস করার বাসনা জানালে। এই তো তোমার যোগ্য কথা।

শেষ পর্যন্ত দার্জিলিং যাওয়া ঠিক হলো।

এখানে স্যর নৃপেন্দ্রনাথ সরকারের 'স্টেপ এ্যাসাইড' নামক বাড়ীতে দেশবন্ধুর থাকার ব্যবস্থা হলো। ১৫ই মে সপরিবারে তিনি দার্জিলিং এলেন। গান্ধী তখন বাংলা পরিভ্রমণ করছিলেন। অসুস্থ বন্ধুকে দেখার জন্য তিনি সপ্তাহকাল দার্জিলিং-এ এলে দেশবন্ধুর আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। এই সময়ে ভারতের এই দুই নেতার মধ্যে কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছিল। রোগশয্যা থেকে এক চিঠিতে মতিলাল নেহরুকে তিনি লিখলেন ঃ "এই বছরের শেষভাগে ও সামনের বছরের গোড়ার দিকটায় আমাদের অনেক কাজ করতে হবে।"

কিন্তু সেই কাজ করার সময় তিনি আর পেলেন না।

১৯২৫। ১৬ই জুন, মঙ্গলবার।

২রা আষাঢ়, ১৩৩২।

সেদিনটা ছিল মেঘাচ্ছন্ন।

"সাজিল প্রথম আঁধার আজি প্রলয়ঙ্কর সাজে।"

বিকেল সাড়ে পাঁচটা। হিমালয়ের পাদমূলে দেশবন্ধু শেষনিশ্বাস ত্যাগ করলেন। শত যুদ্ধের বিজয়ী বীরের মৃত্যু হলো। বাংলার আশা-ভরসা সঙ্গে নিয়ে লোকান্তরে গমন করেন বাঙালীর হৃদয়ের রাজা দেশবন্ধু। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে আচম্বিতে ঘটল একটি ইন্দ্রপতন। ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিলেন এক বিরাট শক্তিমান পুরুষ—যাঁর ভ্রূকুটিভঙ্গে বিচলিত, সন্ত্রস্ত ও বিপর্যস্ত হতে হয়েছিল প্রবল প্রতাপান্বিত ব্রিটিশ রাজশক্তিকে। চিরদিনের

মতো মৃত্যুর যবনিকা নেমে এলো একটি গৌরবময় জীবনের উপর। নিভে গেল বাংলা দেশের আশার প্রদীপ। সমগ্র জাতির বেদনা-বিদ্ধ অন্তর মথিত করে উঠল শুধু হাহাকার। জীবনে যাঁর মুহূর্তের জন্যও বিশ্রামলাভ ঘটেনি, মৃত্যুতে তিনি আজ চিরশান্তি লাভ করলেন।

কিন্তু কীর্তিমান মহাপুরুষের মৃত্যু নেই।

তাই তো রবীন্দ্রনাথ লিখলেন ঃ

এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ।
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান॥

৯

দেশবন্ধুর কথা আমরা যখনি স্মরণ করি, তখনি আমাদের মনের মধ্যে ভেসে ওঠে তাঁর ছবিটি এইভাবে ঃ

নিখিল-চিত্ত-রঞ্জন তুমি উদিলে নিখিল ছানি,—
মহাবীর, কবি, বিদ্রোহী, ত্যাগী, প্রেমিক, কর্মী, জ্ঞানী।

একাধারে তিনি এসবই ছিলেন।

যেমন বর্ণাঢ্য, তেমনি বৈচিত্র্যমণ্ডিত তাঁর জীবন।

তাঁর মধ্যে ছিল একটা বিরাট শক্তি।

বাঙালী দেখেছে সেই শক্তির জাগরণ।

দেখেছে তারা সেই শক্তির বিস্ফোরণ ও উদ্ভাসন।

শক্তির সঙ্গে ছিল ভাব। এই ভাব ও শক্তির সমন্বিত বিগ্রহ ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ।

স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন।

স্বপ্ন দেখেছিলেন সমস্ত বিশ্বজাতির স্বাধীনতা ও মুক্তির।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে—এই বিশ্বাস তাঁর ছিল।

তাই তো তিনি তাঁর জীবন ও জীবনের সর্বস্ব আহুতি দিয়েছিলেন স্বাধীনতার যজ্ঞে। দেশবন্ধুর স্বপ্নের বিহ্বল আত্মচেতনা আমাদের সকলকে একদিন দেশের মুক্তির স্বপ্ন দেখতে উদ্‌বুদ্ধ করেছিল। নেতা হিসাবে এইখানেই ছিল তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব। তাঁর জীবন ও চরিত্রের পরিচয় আছে তাঁর জীবনের বহু ঘটনার মধ্যে। এখানে তার দু-একটা উল্লেখ করছি।

দেশবন্ধু ছিলেন দাতা।

তিনি যেন এ-যুগের দাতাকর্ণ। যেদিন থেকে তিনি কমলার কৃপালাভ করতে থাকেন, সেদিন থেকে দুই হাতে তিনি যে কতো দান করেছেন, সে দানসাগরের ইতিহাস কোনদিনই লেখা হবে না।

১৯২১ সাল। একদিন বহরমপুরে এসেছেন দেশবন্ধু—অসহযোগ আন্দোলনের বাণী প্রচার করতে ও জেলা কংগ্রেসের কর্মীদের সঙ্গে আলাপ করতে। সহকর্মীদের সঙ্গে রাত্রে যখন আলোচনা করছিলেন, তখন এক কন্যাদায়গ্রস্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণ এলেন দেশবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। বললেন তাঁর প্রয়োজনের কথা। কে যেন ব্রাহ্মণকে বলে দিয়েছিল যে, দেশবন্ধুর সঙ্গে একবার দেখা করতে পারলেই কন্যাদায় থেকে উদ্ধার হওয়ার জন্য তাঁকে আর দুশ্চিন্তা করতে হবে না।

—কিন্তু আমি যে একরকম শূন্যহাতেই এখানে এসেছি। আপনি কলকাতায় গিয়ে একবার আমার সঙ্গে দেখা করবেন।—এই কথা বললেন তিনি সেই ব্রাহ্মণকে। ব্রাহ্মণ এলেন কলকাতায়, দেখা করলেন দেশবন্ধুর সঙ্গে। তখন তিনি প্রাকটিস ছেড়ে দিয়েছেন। বাসন্তীদেবীর কাছ থেকে পাঁচশো টাকা চেয়ে নিয়ে তিনি দিলেন ব্রাহ্মণকে।

যখন তিনি ব্যারিস্টারি করতেন, তখন কোন প্রার্থী তাঁর কাছে অর্থসাহায্য চেয়ে বিফলমনোরথ হয়নি। দানে তিনি শুধু মুক্তহস্ত ছিলেন না—দান করতেন নির্বিচারে। গান্ধী একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এরকম নির্বিচারে দান করেন কেন? উত্তরে দেশবন্ধু বলেছিলেন, দান করতে গেলে সেইভাবেই করতে হয়। আবার কেউ যখন তাঁকে বলত, অমুক লোকটা মিথ্যা কথা বলে আপনাকে ঠকিয়ে টাকা নিয়ে গেল। দেশবন্ধু হেসে বলতেন—দেনেওয়ালা তো ভগবান, আমি তো নিমিত্তমাত্র।

এ ভাবটা কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই তাঁর মধ্যে দেখা গিয়েছিল। চিত্তরঞ্জন তখন লণ্ডন মিশনারি স্কুলের ছাত্র। এ্যাটর্নি ভুবনমোহন দাশের ছেলে তিনি। তাঁর এক সহপাঠী ছিল। সে খুব দরিদ্র। একবার ছেলেটি কদিন স্কুলে আসে না দেখে চিত্তরঞ্জন নিজেই তার খোঁজে তাদের বাড়ীতে গেলেন। ছেলেটি কাঁদ-কাঁদ স্বরে বলল—পয়সার অভাবে তার আর লেখাপড়া হবে না। মাইনেই দিতে পারেনি তিন মাস। চিত্তরঞ্জন অমনি বাড়ী এসে বাবাকে সব কথা বললেন। বাবা ছেলেকে চিনতেন। তিনি অমনি পুত্রের কথামত সেই গরীব ছেলেটির স্কুলে পড়ার ব্যবস্থা করে দিলেন।

এমনি হৃদয় নিয়ে অনেক আগে জন্মেছিলেন আর একজন বাঙালী—মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তাঁর সহপাঠী ছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়—গরীব ব্রাহ্মণের ছেলে। দুজনই পড়তেন হিন্দু কলেজে। একদিন ভূদেবের কাছে মধু শুনলেন যে, পয়সার অভাবে তাকে পড়াশুনা বন্ধ করতে হবে—কয়েক মাসের মাইনে বাকী পড়েছে। রাজনারায়ণ দত্তের একমাত্র ছেলে মধুসূদন। বন্ধুর কথা শুনে কেঁদে ফেললেন। বললেন—সে কি ভূদেব, পড়াশুনা ছাড়বে কেন? আমার বাবা বড়লোক। আমি সব ব্যবস্থা করে দেব—দিয়েছিলেনও।

সেই মধুসূদনের বাংলায় চিত্তরঞ্জনের মতো হৃদয়বানের জন্ম হবে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। অভাবী মানুষের অভাব দেখলে চিত্তরঞ্জন স্থির থাকতে পারতেন না। বিদ্যাসাগরের মতোই তাঁর হৃদয় অমনি বিগলিত হতো। একদিন আদালতে বেরুচ্ছেন, গাড়িতে উঠে বসেছেন। এমন সময় পথের পাশ থেকে একটি স্ত্রীলোক এসে দাঁড়ালেন তাঁর সামনে। কোলে একটি শিশু। কী চাই?—জিজ্ঞাসা করেন চিত্তরঞ্জন। স্ত্রীলোকটি নিবেদন করলেন তাঁর প্রয়োজনের

কথা। কোলের ছেলেটির অসুখ, কিছু ওষুধ কিনতে হবে। চিত্তরঞ্জন মুখ বাড়িয়ে দেখলেন, হ্যাঁ ছেলেটি সত্যিই অসুস্থ। 'কত টাকা দরকার ?'—জিজ্ঞাসা করেন। আড়াই টাকা হলেই হবে—বলেন সেই স্ত্রীলোকটি। পকেট থেকে একখানা দশটাকার নোট বের করে তাঁর হাতে দিলেন তিনি। সজলনয়নে হাত পেতে নোটখানি গ্রহণ করেন স্ত্রীলোকটি। একেই বলে দাতা। একেই বলে হৃদয়।

নাগপুর কংগ্রেস থেকে ফিরে চিত্তরঞ্জন সর্বস্ব ত্যাগ করেন। চুরুট ছিল তাঁর খুব প্রিয়। দেশের কল্যাণ করতে নেমে সাহেবী পোশাক ছেড়ে মোটা খদ্দর পরতে আরম্ভ করেন, নইলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশবেন কি করে। দেশের মানুষ তাঁকে মাথায় তুলে নিল, বলল —আপনি আমাদের রাজা। কিন্তু তখনো পর্যন্ত চুরুট ছাড়তে পারেননি। একদিন একজন পরিচিত বন্ধু হেসে বললেন—সবই যখন ছাড়লেন, তখন চুরুটটা আর বাকী রইল কেন ? ঠিক কথা। এটাও ছেড়ে দেওয়া দরকার—ভাবলেন চিত্তরঞ্জন। পরের দিন থেকে তাঁর মুখে আর কেউ চুরুট দেখতে পায়নি।

দেশবন্ধু তখন আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে। এক কয়েদী ওয়ার্ডার তাঁর সেবার জন্য নিযুক্ত হয়েছিল। তার নাম মথুর। দুর্দান্ত কয়েদী —দশ বছর জেল খাটছে। তার মেয়াদ উত্তীর্ণ হতে আর বেশী দেরী ছিল না। দেশবন্ধুর সংস্পর্শে এসে সেই মথুর একেবারে বদলে গেল। একদিন সে তাঁকে বললে—বাবা, আপনি চলে গেলে আমাকে ভুলবেন না তো ? কেনরে মথুর ?—জিজ্ঞাসা করেন দেশবন্ধু।—বাবা, আমি জেল থেকে খালাস পেয়ে আপনার কাছে থাকব।—বেশ তো, আসিস্।—এই কথা বললেন তিনি। তারপর কিছুদিন বাদে জেল থেকে খালাস পেয়ে মথুর সত্যিই একদিন রসারোডের বাড়ীতে এসে হাজির। দেশবন্ধু মথুরকে ভোলেননি।

অনেকের আপত্তি সত্ত্বেও তিনি তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। এমনি ছিল তাঁর মহানুভবতা।

আসামের চা-বাগানে কুলিদের উপর অত্যাচার হয়েছে। তারা দলে দলে এসেছে চাঁদপুর। সেখান থেকে তারা দেশে ফিরে যাবে, আর কুলিগিরি করবে না। কিন্তু যাওয়ার জন্য তাদের টিকিট দেওয়া হচ্ছে না। রেল-স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের উপর হাজার হাজার কুলি। তারা খবর পেল দেশবন্ধু আসছেন সেখানে। অমনি তাদের মধ্যে বিশ্বাস জাগল দেশবন্ধু এলেই সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। পদ্মা পার হয়ে আসতে হবে চাঁদপুর। তখন বর্ষাকাল। তার ওপর কুলি ধর্মঘটের জন্য স্টিমার চলাচল বন্ধ। গোয়ালন্দ থেকে নৌকায় চড়েই দেশবন্ধু চললেন চাঁদপুর। যেতেই হবে; কুলিদের জন্য তাঁর সে কি আকুলতা! আকাশের দিকে তাকিয়ে মাঝি বলে, বাবু ঝড় উঠবে। আজ যাবেন না। নিষেধ মানলেন না তিনি। কুলিদের জন্য তখন তিনি অস্থির হয়েছেন। মাঝ দরিয়ায় ঝড় উঠল। পদ্মায় ঢেউ উঠল। মাঝি-মাল্লা ভয় পেল। নৌকোর গায়ে লাগছে ঢেউয়ের আছাড়। নৌকো দুলছে। কিন্তু দেশবন্ধুর ভয় নেই। সঙ্গে ছিলেন বাসন্তীদেবী। যাই হোক, সবাই রক্ষা পেলেন। দেশবন্ধু সেই সময় বলেছিলেন—মানুষের সেবায় নেমেছি, তাদের আশীর্বাদ রয়েছে, অমঙ্গল হবে কেন?

সকলের হৃদয়ের রাজা এই মানুষটির পিতামাতা নাম রেখেছিলেন চিত্তরঞ্জন। সার্থক নাম। মানুষের চিত্তকে এমনভাবে দরদ দিয়ে রাঙিয়ে তুলতে আর কেউ পারেনি। তাইতো দেশের লোকে তাঁকে ডাকতো 'দেশবন্ধু' বলে। তিনি সত্যিই দেশের ও দশের বন্ধু ছিলেন। বিদ্যাসাগরের পর বুঝি এতবড়ো দরদী মানুষ বাংলা দেশে আর কেউ জন্মগ্রহণ করেননি।

যেদিন থেকে শুরু হয় তাঁর পথযাত্রা, সেদিন কে জানতো যে দুই হাতে উপার্জন করে দশ হাতে তিনি বিলিয়ে দেবেন। বহু লক্ষ টাকা আয় করতেন তিনি, তেমনি দান করে গেছেন নিজেকে উজাড় করে। যাঁর বিলাসিতার শেষ ছিল না, সেই মানুষ যে কেমন করে দু'হাতে দান করতেন তা ভাবলে সত্যি বিস্মিত হতে হয়।

এক জ্বলন্ত ত্যাগের মূর্তি নিয়ে দেশের সামনে আবির্ভূত হয়ে দেশবাসীর হৃদয় কেড়ে নিয়েছিলেন দেশবন্ধু। পুরাতন বৎসরের জীর্ণক্লান্ত রাত্রি যেন কেটে গিয়েছিল তাঁর আবির্ভাবে। দেখা দিয়েছিল এক নতুন প্রভাত। দিকে দিকে উড়েছিল নতুনের কেতন। এসবই সম্ভব হয়েছিল তাঁর অত্যাশ্চর্য ত্যাগ ও চরিত্রের মাধুর্যের ফলে।

ভোগে ইন্দ্র,
ত্যাগে দধীচি,
দানে দাতাকর্ণ, অথবা হরিশ্চন্দ্র,
জনসেবায় সিদ্ধার্থ।

আর রাজনীতিক্ষেত্রে একাধারে প্রতাপ-শিবাজী—এই তো দেশবন্ধু, এই তো দেশবন্ধুর জীবন, এই তো তাঁর চরিত্র। তাঁর চিন্তা ছিল বড়ো, স্বপ্ন ছিল আরো বড়ো। দেশবন্ধুর যখন মৃত্যু হয়, তাঁর প্রিয়তম শিষ্য সুভাষচন্দ্র তখন মান্দালয় জেলে। সেখান থেকে এই দুঃসংবাদে যারপরনাই মর্মাহত হয়ে এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: "যজ্ঞের যিনি ছিলেন হোতা, ঋত্বিক, প্রধান পুরোহিত, যজ্ঞের সমাপ্তির আগেই তিনি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ভিতরের আগুন আর বাহিরের কর্মভার—এই দুইয়ের চাপ তাঁর পার্থিব দেহ

আর সহ্য করতে পারল না।" রাজবন্দী সুভাষের মনে এই চিন্তা কাঁটার মতো বিঁধেছিল।

ত্যাগ যেমন, তেমনি দেশবন্ধুর চরিত্রের অপর বৈশিষ্ট্য ছিল স্নেহ ও প্রীতি। নাগপুরে একজন সাধারণ বাঙালী কংগ্রেস-কর্মীর মৃত্যু হলো। কংগ্রেসের সেবকরা যখন সেই মৃতদেহ নিয়ে শোভাযাত্রা করে শ্মশানে যায়, দেশবন্ধু ছিলেন তার পুরোভাগে—দু'তিন মাইল পথ তিনি পায়ে হেঁটেই গিয়েছিলেন। অন্যান্য সহকর্মী ও শিষ্য-স্থানীয়দের সকলকেই তিনি এমন স্নেহের চক্ষে দেখতেন। তাঁদের প্রতি তাঁর ব্যবহার এমনি সহৃদয় ও মধুর ছিল যে, তাঁরা প্রত্যেকেই মনে করতেন যে আমাকে তিনি অমুকের সমান—হয়ত বেশীই ভালবাসেন।

আসল কথা, রাজনীতি তাঁকে গ্রাস করতে পারলেও, তাঁর হৃদয়টাকে গ্রাস করতে পারেনি। কর্মীদের নিয়ে তাইতো তিনি রাজনীতির শুষ্ক পরিবেশের মধ্যেও একটা স্নেহের নীড় রচনা করেছিলেন। তাইতো বাস্তবের ধূসর ঊষরতার মধ্যেও একটি পরিপূর্ণ হৃদয়ের পরিচয় তারা পেয়েছিল—যে হৃদয় থেকে নির্গত হতো সবল, সরল, শীতল বারিধারা। সেই বারিধারার স্পর্শ লাভ করে সকলের মন তৃপ্ত হতো।

প্রবল ইচ্ছাশক্তি অথবা প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব—এসব তো তাঁর ছিলই, কিন্তু দেশবন্ধুর আর একটা গুণ ছিল—হৃদয়-মাধুর্য। এর জন্যই তো তাঁর চরিত্র অমন অনুপম সৌন্দর্যে মণ্ডিত হতে পেরেছিল। তাঁর নেতৃত্বের মধ্যে যেমন দেখা গিয়েছিল বজ্রগর্ভ কালবৈশাখীর মেঘ যার গভীর গর্জনে নিদ্রিত ত্রিশ কোটি নরনারীর তন্দ্রা ভেঙে গিয়েছিল—আকাশভেদী রাজপ্রাসাদের চূড়া থেকে ভিত্তি পর্যন্ত যার প্রচণ্ড আঘাতে কেঁপে উঠেছিল—সেই মেঘের মধ্যে কি করুণার স্নিগ্ধতার

বারি সঞ্চিত ছিল তা দেশ জানত। তাইতো আষাঢ়ের সেই ম্লান অপরাহ্ণে বাংলার ঘরে ঘরে কেবল নেতার অভাবে শোক নয়, বন্ধুর বিহনে শোক অনুভব করেছে।

দেশবন্ধুর শেষজীবনের মাধুর্য যেন আরো নিবিড়ভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। সে ক্ষত্রিয়সুলভ তেজ, দম্ভ, অথবা গর্ব—সব-কিছু যেন মৃদু হয়ে এসেছিল। কি একটা অপার্থিব রূপান্তর দেখা গিয়েছিল তাঁর মধ্যে দার্জিলিং-এর সেই এক মাস কালের সময়। তাঁর মৃত্যুতে বাংলার অন্তঃস্থলে হৃদয়ের যে শূন্য সিংহাসন ঘিরে সেদিন হাহারব উঠেছিল—সেই সিংহাসন কিন্তু আজো শূন্য রয়েছে। এমনি শূন্য থাকবে চিরদিন। কারণ, এমন দরদভরা হৃদয় নিয়ে আর কেউ বাংলার মাটিতে জন্মাবেন কিনা সন্দেহ!

রাজনীতিতে অনেকের সঙ্গে তাঁর মতান্তর ঘটত—কিন্তু কখনো কারো সঙ্গে ঘটত না মনান্তর। বিপিনচন্দ্র পাল তাই বলেছেন যে, মত ও নীতির গণ্ডি ছাড়িয়ে চিত্তরঞ্জনের ব্যক্তিত্ব সতত উজ্জ্বল। দেশের মঙ্গলের জন্য, জাতির উন্নতির জন্য যা তিনি আবশ্যক বলে বিবেচনা করতেন, তার জন্য কোন প্রকার ত্যাগস্বীকারেই দেশবন্ধু কুণ্ঠিত হতেন না। দেশের কাজে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবেই নিবেদন করেছিলেন। এইজন্যই তাঁর দেশপ্রেম দেশের ইতিহাসে চিরকাল ভাস্বর হয়ে থাকবে। তাঁর মৃত্যু সাধারণ মৃত্যু নয়—তা হলো দেশ-মাতৃকার চরণে আত্মবলি।

পরাধীন জাতির মুক্তির জন্য তিনি নিজের প্রাণ উৎসর্গ করলেন।

প্রত্যক্ষ হয়ে রইল তাঁর কর্মের সফলতা তাঁর স্বদেশবাসীর কাছে। এতবড়ো প্রাণের বিনাশ নেই—দেশবন্ধু তাই তাঁর মৃত্যুর মধ্যেই অমৃতের সন্ধান পেয়েছিলেন। ত্যাগে সুন্দর, কর্মে ভাস্বর, প্রেমে উজ্জ্বল এই জীবনের মহিমা আমরা যেন উপলব্ধি করতে পারি।

আজ তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করে রবীন্দ্রনাথের কথায় বলি ঃ

স্বদেশের যে ধূলিরে শেষ স্পর্শ দিয়ে গেলে তুমি,
বক্ষের অঞ্চল পাতে সেথায় তোমার জন্মভূমি।
দেশের বন্দনা বাজে শব্দহীন পাষাণের গীতে
এসো, দেহহীন স্মৃতি মৃত্যুহীন প্রেমের সঙ্গীতে।

ইন্দ্র-পতন*

কাজী নজরুল ইসলাম

পয়গম্বর ও অবতার যুগে জন্মিনি মোরা কেহ ;
দেখিনিক মোরা তাঁদেরে ; দেখিনি দেবের জ্যোতির্দেহ ;
কিন্তু যখনি বসিতে পেরেছি তোমার চরণ-তলে
না জানিতে কিছু না বুঝিতে কিছু ভরেছে নয়ন-জলে !
সারা প্রাণ যেন অঞ্জলি হয়ে ও-পায়ে পড়েছে লুটি,
সকল গর্ব উঠেছে মধুর প্রণাম হইয়া ফুটি !
... ...
তোমারে দেখিয়া কাহারও হৃদয়ে জাগেনিক সন্দেহ
হিন্দু কিংবা মুসলিম্ তুমি, অথবা অন্য কেহ !
তুমি আর্তের, তুমি বেদনার, ছিলে সকলের তুমি,
সবারে যেমন আলো দেয় রবি, ফুল দেয় সবে ভূমি।
হিন্দুর ছিলে আকবর, মুসলিমের আরংজীব,
যেখানে দেখেছ জীবের বেদনা, সেখানে দেখেছ শিব !
... ...

---

* অংশ বিশেষ

আজ শুধু জাগে তব অপরূপ সৃষ্টি-কাহিনী মনে,
তুমি দেখা দিলে অমিয়-কণ্ঠ বাণীর কমল-বনে।
কখন তোমার বীণা ছেয়ে গেল সোনার পদ্মদলে,
হেরিনু সহসা ত্যাগের তপন তোমার ললাট তলে।
লক্ষ্মী দানিল সোনার পাপড়ি, বীণা দিল করে বাণী
শিব মাখালেন ত্যাগের বিভূতি, কণ্ঠে গরল দানি।
বিষ্ণু দিলেন ভাঙনের গদা, যশোদা-দুলাল বাঁশী,
দিলেন অমিত তেজ ভাস্কর, মৃগাঙ্ক দিল হাসি।
চির-গৈরিক দিয়া আশিসিল ভারত-জননী কাঁদি,
প্রতাপ শিবাজী দানিল মন্ত্র, দিল উষ্ণীষ বাঁধি।
বুদ্ধ দিলেন ভিক্ষাভাণ্ড, নিমাই দিলেন ঝুলি,
দেবতারা দিল মন্দার-মালা, মানব মাখাল ধূলি।
নিখিল-চিত্ত-রঞ্জন তুমি উদিলে নিখিল ছানি,—
মহাবীর, কবি, বিদ্রোহী, ত্যাগী, প্রেমিক, কর্মী, জ্ঞানী।
...   .

—•—